স্বপ্নে

বিমল কর

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

মাসের মধ্যে আঠাশ দিন দেরি, দিন দুই সময় মতন। এই গাড়ির এই রকমই হাল। মাস দশেক হল নতুন চালু হয়েছে। হওয়া ইস্তক তার মরজি মতন আসছে যাচ্ছে। আজ সময় মতন এসেছিল। দু চার মিনিট আগেও হতে পারে। ছেড়েও গেল কাঁটায় কাঁটায়।

হাতের কাজকর্ম শেষ করে ফেলেছিল বাসুদেব। এখন সোয়া সাত প্রায়। আটটায় বাসুদেবের ছুটি। আটটায় প্রকাশ আসবে। প্রকাশের নাইট।

এখন বুকিং অফিসের ধারে কাছে কেউ নেই। সামান্য তফাতে মুসাফিরখানা, এক ধারে পাঁড়ের মিষ্টির দোকান, তার পাশেই বনোয়ারীর চায়ের স্টল।

মুসাফিরখানাও ফাঁকা, দু চার জন কুলিকাবারী বসে গল্পগুজব করছে।

কোনো কাজ নেই। হাত ফাঁকা। বাসুদেব টিকিট কাউণ্টারের খোপটা বন্ধ করল। প্লাটফর্মের দিকের জানলাটা বন্ধ করল না; কোনো দরকার নেই।

চাবির গোছা হাতে নিয়ে বাইরে এল বাসুদেব। বুকিং অফিসের দরজায় তালা দিল। রামলগন কাছাকাছি খইনির আসরে বসে আছে।

রামলগনকে নজর রাখতে বলে বাসুদেব প্লাটফর্মের দিকে পা বাড়াল।

আজ সারাটা দিন বেশ গরম গিয়েছে। এই এখন, সন্ধ্যের দিকে হাওয়া উঠল। এখানে গরমটা এই রকমই। বেলা নটা বড় জোর, তারপর যেন আগুন ধরে যায় দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আকাশ। গাছপালা পুড়ে যায়। দেখতে দেখতে লু ওঠে। অবশ্য মাসটা এখন চৈত্র; গরমের বাড়াবাড়ি তো হবেই।

বাসুদেবের গরম ঠাণ্ডা নিয়ে খুঁতখুতুনি নেই। চাকরি করতে বেরিয়ে কে আর নিজের পছন্দমতন রোদ বৃষ্টি আশা করে। বাসুদেব আজ বছর ছয় হল রেলের চাকরি করছে। বুকিং ক্লার্ক। ছ' বছরে তিন চার ঘাটের জল খেয়েছে। প্রথমে ছিল সালানপুরে। সেখান থেকে বদলি হয়ে এল কালিপাহাড়ী। চার মাসও কাটল না, রিলিফে যেতে হল বরাকর, তারপর এখানে।

এখানে মাস ছয় হয়ে গেল বাসুদেবের। ভালই লাগছে। বড় সড় স্টেশন নয়, রোড সাইড স্টেশন, ভিড় ভারাক্কা তেমন কিছু নেই, নিশ্চিন্তেই কেটে যাচ্ছে। বরং জায়গা হিসেবে বাসুদেবের পছন্দই হয়েছে। বেশ ফাঁকা, শুকনো-শাকনা জঙ্গল গোছের জায়গা। জলটল ভাল। স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। শরীর স্বাস্থ্য তো ভালই থাকছে বাসুদেবের।

বুকিং অফিসের বাইরে, হাত কয়েক তফাতে রেলিং দিয়ে ঘেরা মুসাফিরখানার চৌহদ্দি। বাঁয়ে মানুষ গলে যাওয়ার মতন একটা পথ। বাসুদেবরা এই ফাঁক দিয়ে গলে লাইন টপকে প্লাটফর্মে আসা-যাওয়া করে। ওভারব্রিজ দিয়ে যেতে হলে অনেকটা ঘুর পথ।

রেল লাইন টপকাবার সময় ডাইনে বাঁয়ে তাকাল বাসুদেব, অভ্যাসমতন। কোথাও কিছু নেই। ডাইনের ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যাল দেখা যায়। লাল হয়ে রয়েছে।

লাইন টপকে বাসুদেব প্লাটফর্মে এসে উঠল। নিত্য এই পথে আসা-যাওয়া বলে প্লাটফর্মের নীচে লাইন ঘেঁষে পাথর সাজানো রয়েছে সুবিধের জন্যে, তেমন কিছু লাফালাফি করে উঠতে হয় না প্লাটফর্মে।

প্লাটফর্মে উঠতেই দমকা হাওয়া গায়ে লাগল। চমৎকার বাতাস বইছে। চৈত্রের হাওয়া। এই হাওয়া খেতে, একটু গল্প গুজব করতে স্টেশনে আসা। প্লাটফর্মের টিস্টলে চা-টাও মন্দ করে না।

এখন শর্মার ডিউটি। শর্মা আর সিংজীর।

প্লাটফর্ম একেবারে ফাঁকা। নিঃসাড়। ওজন-মেশিনের ওপর ফাগুয়া শুয়ে আছে।

বাসুদেব পকেট থেকে প্যাকেট বার করে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল। তাকাল ডান দিকে, প্লাটফর্মের পুবে ইস্ট কেবিনের দিক থেকেই হাওয়া আসছে। ও-দিকে জঙ্গল উঁচু, নিচু মাঠ, বিস্তর পলাশগাছ ছাড়া কিছু নেই। অনেক তফাতে একটা ভাঙা-চোরা মিলিটারি ক্যাম্পের জল-ট্যাঁকিটা উচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনও।

আকাশে তারা। আবার চাঁদও উঠেছে একফালি।

বাসুদেব স্টেশনের অফিস ঘরের দিকে পা বাড়াল।

এ এস এম অফিসে ঢোকার মুখে বাসুদেবের চোখ পড়ে গেল বেঞ্চির ওপর। হাত কয়েক দূরে এক মহিলা বসে আছেন। বাঙালী বলেই মনে হল। সন্ধ্যেবেলায় প্লাটফর্মে বসে থাকার মতন বাঙালী মহিলা এখানে কে আছেন?

দু পলক দেখল বাসুদেব, সামান্য অবাক হল, তারপর এ এস এম অফিসে ঢুকল।

শর্মা নেই। এ এস এম সিংজী অন্য স্টেশনের সঙ্গে কথা বলছেন

ফোনে।

বাসুদেব বলল, "শর্মা কোথায় সিংজী?"

সিংজীর বয়েস হয়েছে। আর বছর তিন পরে রিটায়ার করবেন। খোঁড়া বউ, তিন চারটে অপদার্থ ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছেন সিংজী। বড় ছেলে 'নাওটাঙ্গী' করে বেড়ায়, মেয়ের বিয়ে হয়েছিল মতিহারীতে, শ্বশুরবাড়িতে বাপ, চাচা, ছেলেতে খুনোখুনি চলছে। সিংজীর জামাই এখন জেলে। মেয়ে বাপের কাছে এসে রয়েছে।

মানুষটি কিন্তু ভালই সিংজী। ধর্মভীরু। পুজো আর্চার দিকে খুব ঝোঁক।

ফোন নামিয়ে রেখে সিংজী বললেন, "আরে, শর্মা তো চুনিবাবুকা সাথ ঘুমথা থা দেখো কাঁহা গিয়া।"

বাসুদেব বুঝতে পারল, শর্মা স্টেশনে নেই। চুনিবাবুর সঙ্গে থাকা মানে শর্মা বাজারে গিয়েছে। কবিরাজের দোকানে মোদক খেতে। বেটার বড় নেশা। রোজই প্রায় মোদক খায়। এখন, কোনো গাড়ি-টাড়িও আসছে না; হাত ফাঁকা, শর্মা নিশ্চিন্তে মোদক খেতে গিয়েছে। টিকিট কালেক্টারের চাকরি তাকেই মানায়।

সিংজী কিসের একটা কাজ নিয়ে বসছিলেন, বাসুদেব চলে আসছিল। হঠাৎ সিংজী ডাকলেন, "বাসুদেও, আরে শুনো, ওয়েটিং রুমমে যাও না থোড়া; দেখো উয়ো বাংগালী আওরাত— হোয়াট সি ইজ টেলিঙ? হামারা কুছ সামাঝ মে নেহি আয়া।"

বাসুদেব বাইরে এল। এ এস এম অফিসের গায়ে স্টেশন মাস্টারের ঘর। এখন বন্ধ। স্টেশন মাস্টারের অফিসের গা-লাগোয়া ওয়েটিং রুম। খুবই ছোটখাট। একটা খোপই বলা যায়।

মহিলা বাইরের বেঞ্চিতে বসে আছেন।

বাসুদেব সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মুখ তুললেন মহিলা।

বাসুদেব লক্ষ্য করল। বয়স কম নয় মহিলার। চল্লিশ হতে পারে। গায়ের রঙ শ্যামলাই কিছুটা ফরসা ঘেঁষা। মুখটি সামান্য গোল ধরনের, আদলটি দেখতে ভাল লাগে। চোখ একটু বড়।

সিঁথিতে সিঁদুর ছিল মহিলার, পাতলা সিঁদুর।

মহিলাকে কেমন বিপন্ন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টিতে বিহ্বলতা। বাসুদেবকে যেন আগ্রহের সঙ্গে দেখছিলেন।

কী বলবে বুঝতে পারল না বাসুদেব। ইতস্তত করল। বলল, "আপনি কি ট্রেনের জন্যে বসে আছেন?"

জবাব দিলেন না মহিলা। বাসুদেবকে গভীর করে দেখছিলেন।

বাসুদেব অনুমান করছিল, মহিলা হয়ত সোয়া দশটার গাড়ি ধরার জন্যে এসে বসে আছেন। তার এখন অনেক দেরী। কিন্তু এলেন কোথা থেকে? মহুয়াবাঁধের বাস এখনও আসে নি। ন'টা নাগাদ আসবে। সেটাই শেষ বাস। আগের বাসটা এসেছে বিকেলে। মহুয়াবাঁধের দিকে নতুন এক কেবল ফ্যাক্টরী চালু হয়েছে। বাঙালী সাহেবসুবো দু'চার জন আছে। তাদের কেউ হতে পারেন মহিলা। চেহারা সাজপোশাকে সেইরকম লাগছে।

বাসুদেব আবার বলল, "আপনি কি মহুয়াবাঁধ থেকে আসছেন?"

মহিলা কী বলতে যাচ্ছিলেন, ঠোঁট কাঁপল, গলায় শব্দ ফুটল না। গলা জড়িয়ে ভাঙা শব্দ বেরুলো কেমন।

বাসুদেব অপেক্ষা করছিল। মহিলা কিছু বলতেও পারছিলেন না।

“বাসে এসেছেন আপনি ? কোথায় যাবেন ?” বাসুদেব বলল।

মহিলা মাথা নাড়লেন। “ট্রেনে এসেছি।”

বাসুদেব অবাক হল। “সাতটার গাড়ি ?”

মাথা নোয়ালেন মহিলা। তাই এসেছেন।

বাসুদেব বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। গাড়ি এসে কখন চলে গিয়েছে—উনি বসেই আছেন। তা হলে কি ট্রেন থেকে নেমে বাস ধরার কথা ছিল ? সেই বাসও তো কখন চলে গিয়েছে ট্রেনের প্যাসেঞ্জার নিয়ে। নাকি ওঁকে কারোর নিতে আসার কথা ছিল, আসতে না পারায় উনি জলে পড়ে গিয়েছেন।

“কোথায় যাবেন আপনি ?” বাসুদেব জিজ্ঞেস করল।

বিব্রত, অসহায়, বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে থাকলেন মহিলা। কথা বলতে পারছিলেন না।

বাসুদেব নিজেই যেন বোকা হয়ে যাচ্ছিল। মহিলা তো বড় অদ্ভুত।

“আমি এখানে রেলে চাকরি করি,” বাসুদেব বলল, ভদ্রমহিলাকে যেন ভরসা দিচ্ছে, বোঝাচ্ছে, “আপনার যদি কিছু ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা হয়ে থাকে আমায় বলুন, যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।”

মহিলা ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর আচমকা বললেন, “এখানে কোথাও থাকার জায়গা নেই ?”

“থাকার জায়গা ? এখানে ?” বাসুদেব থতমত খেয়ে গেল।

“হোটেল ?”

“হোটেল ! না না হোটেল কোথায় ! এই ছোট্ট জায়গায় হোটেল ?”

“ধর্মশালা ?”

মাথা নাড়ল বাসুদেব। "না। ও-রকম কিছু নেই।"

মহিলা অপ্রতিভ গলায় বললেন, "আমার ভুল হয়ে গেছে। ঠিক খেয়াল করি নি, নেমে পড়েছি।"

বাসুদেব আরও খুঁটিয়ে মহিলাকে দেখছিল। "আপনি ভুল করে হঠাৎ ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন? সঙ্গে কেউ ছিল না?"

"না।"

"যাচ্ছিলেন কোথায়?"

মহিলা জবাব দিলেন না। যেন কোথায় যাচ্ছিলেন নিজেই জানেন না; কিংবা জবাব দেবার কোনো প্রয়োজন তাঁর নেই।

বাসুদেবের সন্দেহ হচ্ছিল, মহিলা অপ্রকৃতিস্থ। বাইরে থেকে অবশ্য কিছু বোঝা যায় না। মার্জিত পরিচ্ছন্ন চেহারা, সম্ভ্রান্ত ভাব রয়েছে। শাড়িজামায় অকারণ শৌখিনতা নেই। মহিলাকে দেখতে ভাল লাগে; চোখে মুখে কোথাও উগ্রতা নেই, বরং নরম অথচ বিষণ্ণ ভাব।

বাসুদেব বলল, "আপনি কি জিনিসপত্র রেখেই নেমে পড়েছেন গাড়ি থেকে?"

মহিলা মাথা নাড়লেন। ওয়েটিংরুমের ভেতরটা দেখালেন। "সুটকেস আছে। ভেতরে রয়েছে।"

কী মনে করে বাসুদেব বলল, "টিকিট ছিল?"

কোলের ওপর রাখা ব্যাগটা দেখালেন মহিলা।

"দেখি—" টিকিট দেখতে চাইল বাসুদেব।

মহিলা ব্যাগ খুলে টিকিটটা বার করে দিলেন।

টিকিট দেখল বাসুদেব। "মোগলসরাই যাচ্ছিলেন?"

"মোগলসরাই—!"

"মোগলসরাইয়ের টিকিট?" বাসুদেব কোনো হদিস করতে পারছিল না।

"তা হবে!" মহিলা অন্যমনস্কভাবে বললেন। সামান্য চুপচাপ, শেষে কাতর চোখে, অনুনয়ের গলায় বললেন, "আমার একটা থাকার ব্যবস্থা করে দিন না।"

"থাকার ব্যবস্থা—!" বাসুদেব কোথাও কোনো ব্যবস্থা দেখতে পেল না। "এখানে থাকার ব্যবস্থা কী করব। আপনি ওয়েটিংরুমে থাকতে পারেন, ভোরের দিকে আবার গাড়ি পাবেন। রাত্তিরে এ এস এম যিনি থাকবেন, তিনি না হয় আপনাকে ট্রেনে তুলে দেবেন সে-ব্যবস্থা আমি করে যাচ্ছি।" টিকিটটা ফেরত দিয়ে দিল বাসুদেব।

হতাশ, কাতর দেখাল মহিলাকে। ওয়েটিংরুমে রাত কাটাতে তাঁর ইচ্ছে নেই।

"আপনি কোথায় থাকেন?" ভদ্রমহিলা আচমকা জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি!···কাছেই থাকি রেলের কোয়ার্টারে?"

"বাড়িতে মেয়েরা আছেন না!"

"না! একা থাকি।"

কী যেন ভাবলেন মহিলা, তারপর ব্যাকুল, করুণ গলায় মিনতি করে বললেন, "আপনার বাড়িতে আমায় একটু থাকতে দিন না, ভাই।"

বাসুদেব অবাক হল! "আমার বাড়িতে আপনি কি করে থাকবেন! আমি একলা থাকি।"

"তাতে কি! একটা রাত থাকতে পারব।"

সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। সন্দেহ হচ্ছিল বাসুদেবের, আবার

মহিলার মুখ দেখলে সন্দেহের কোনো কারণ থাকে না। নম্র, ভদ্র, সরল মুখ। বিষণ্ণ। তবু বাসুদেব নিশ্চিত হতে পারছিল না।

"আপনি ওয়েটিংরুমেই থাকুন—" বাসুদেব বলল, "আমার ওখানে অসুবিধে হবে।"

মহিলা বাসুদেবকে লক্ষ্য করলেন। বললেন, "ও! আচ্ছা!"

বাসুদেব অস্বস্তি বোধ করল। ক্ষুণ্ণ হয়েছেন মহিলা। কিন্তু বাসুদেবেরই বা কি করার আছে! অজানা, অচেনা এক মহিলাকে সে কেমন করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে! কাজটা অনুচিত।

চলে আসব ভেবেও বাসুদেব আসতে পারছিল না। সঙ্কোচ হচ্ছিল। কোনো সন্দেহ নেই মহিলা বিপন্ন বোধ করছেন। ওয়েটিং-রুমে একা সারা রাত বসে থাকাও কি নিরাপদ?

হঠাৎ মহিলা বললেন, "এখানে কোথায় নাকি একটা আশ্রম আছে?"

"আশ্রম! এখানে—? কই না।"

"আছে।"

"আমি তো শুনি নি। অন্য কোথাও থাকতে পারে।···আপনি কি আশ্রমে যাবেন বলে নেমে পড়েছিলেন?"

"ভেবেছিলাম। যাক আপনি যান। রাতটুকু কাটুক, তারপর—"

বাসুদেব বিব্রত বোধ করল। মহিলা ক্ষুব্ধ, দুঃখিত। বাসুদেবের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, নিরাশ হয়েছেন।

কিছু বলতে যাচ্ছিল বাসুদেব, তার আগেই মহিলা বললেন, "আপনি বয়েসে আমার চেয়ে ছোট ভাই; ভয় পাবার মতন মানুষ আমি নই।"

বাসুদেব লজ্জা পেল। বলল, "সে-কথা নয়। আমার কথা ভেবে আমি কিছু বলি নি। আমার কোয়ার্টারে আমি একলা থাকি। আমাকেই বা আপনি বিশ্বাস করলেন কেন?"

দু পলক বাসুদেবের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন মহিলা। তারপর শান্ত গলায় বললেন, "আমি তো করেছি।"

বাসুদেব কিছু ভাবছিল। অভিমানে লাগল বোধ হয়। কিংবা মনে হল, তারই বা এত অবিশ্বাস কেন। মহিলা নিশ্চয় অদ্ভুত, তা বলে বিশ্বাস না করার মতন তো নয়। বলল, "আমার এখনও ডিউটি শেষ হয় নি। আটটায় শেষ হবে। ইচ্ছে করলে আপনি আমার সঙ্গে অফিসে যেতে পারেন। না হয়, আপনি এখানেই থাকুন। আমি সিংজীকে বলে যাচ্ছি। পরে আমি কুলি পাঠিয়ে দেব। আপনাকে নিয়ে যাবে। আমি নিজেও আসতে পারি।"

মহিলা যেন কৃতার্থ হয়ে বাসুদেবের দিকে তাকালেন। চোখেমুখে স্বস্তির ভাব এল।

বাসুদেব আর অপেক্ষা করল না।

দুই

দরজায় দাঁড়িয়ে বাসুদেব বলল, "এই আমার আস্তানা।"

সুটকেস হাতে ফাগুয়ালাল আগে আগে এসে পৌঁছেছে। তালা-বন্ধ সদরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

বাসুদেব তালা খুলতে খুলতে আড়ষ্ট, নীচু গলায় বলল, "আপনার খুব অসুবিধে হবে।"

বাসুদেবের হাত কয়েক পিছনে মহিলা। নাম বলেছেন, মণিমালা।

মণিমালা কোনো জবাব দিল না।

দরজা খুলে বাসুদেব নিজেই পা বাড়াল। ভেতরটা অন্ধকার। খুব গাঢ় নয়, হালকা একটু রেশ আছে জ্যোৎস্নার উঠোনটা নজর করা যায়। একেবারে ফাঁকা। কাপড় শুকোবার একটা তার শুধু ঝুলছে।

ফাগুয়া সুটকেস এনে বারান্দায় নামিয়ে রাখল।

বাসুদেব আর ফাগুয়াকে আটকাল না। ছেড়ে দিল।

মণিমালা ফাঁকা উঠোনে দাঁড়িয়ে। কোথাও কিছু চোখে পড়ার মতন নেই, শুধু একপাশে ঝোপের মতন কি একটা গাছ যেন।

বাসুদেব বলল, "আপনি দাঁড়ান, আমি বাতি জ্বালি। আমার এখানে ইলেকট্রিক নেই।"

সাড়া দিল না মণিমালা।

বাসুদেব ঘরের তালা খুলল। খুলে ভেতরে গেল।

পাশাপাশি দুটো ঘর। ঘরের গায়ে ছোট বারান্দা। একটা খাটিয়া পাতা ছিল।

মণিমালা যেমন দাঁড়িয়ে ছিল দাঁড়িয়েই থাকল, এক পাও নড়ল না। আকাশের দিকে তাকাল শুধু।

এখন বাতাস এলোমেলো। একেবারে ঝোড়ো নয়, কিন্তু দমকা আছে।

ছোট মতন লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে বাসুদেব বাইরে এল। এসে দাঁড়িয়ে থাকল বোকার মতন। তারপর ইতস্তত করে বলল, "আপনি ভেতরে আসুন, আপনার সুটকেসটা আমি তুলে দিচ্ছি।"

মণিমালার যেন ব্যস্ততা নেই। অন্যমনস্কভাবে একটু শব্দ করল।

বাসুদেব স্যুটকেস তুলতে তুলতে বলল, "এটাও রেলের কোয়ার্টার; আমার নয়। ফাঁকা পড়ে আছে বলে আমি থাকি।"

বাসুদেব ঘরে চলে গেল।

আরও দু দণ্ড বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে মণিমালা ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়াল।

হাত কয়েকের ছোট ঘর। দু পাশে দুই জানলা। বড়, ছোট। বাসুদেব জানলা খুলে দিয়েছে আগেই। সরু মতন একটা তক্তপোশ, পলকা এক টেবিল আর টিনের চেয়ার ছাড়া অন্য কোনো আসবাব চোখে পড়ে না। টেবিলের একপাশে ছোট ল্যাম্প জ্বলছিল।

মণিমালা কেমন অলস, ক্লান্ত চোখে সব দেখছিল। না কৌতূহল, না বিস্ময়। তক্তপোশের ওপর মামুলী বিছানা পাতা, টেবিলের ওপর একটা ট্রানজিস্টার, দু জোড়া তাসের প্যাকেট, এক আধটা বই, পত্রিকা কাগজ-টাগজ। ঘরের একপাশে একটা দেওয়াল-র‍্যাক; বাসুদেবের জামা, গেঞ্জি, পাজামা ঝুলছে।

টেবিলের বাতিটা আরও একটু বাড়াবার চেষ্টা করল বাসুদেব। শিস উঠে যাচ্ছে। বাড়ানো গেল না।

মণিমালার দিকে মুখ ফেরাল বাসুদেব। কি বলবে না-বলবে বুঝতে পারছিল না। শেষে বলল, "আপনি এবার একটু জিরিয়ে নিয়ে গা হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিন। ট্রেনের ধকল সয়েছেন সারাদিন। কলঘরে জল-টল ভরা আছে, সেদিকে কোনো অসুবিধে হবে না।"

বাসুদেব ঘর ছেড়ে চলে যাবার ভাব করল, মণিমালা চৌকাঠের সামনে, যেন একটু জায়গা পেলেই, সে বাইরে চলে যায়!

মণিমালা বলল, "অনেক অসুবিধে করছি, ভাই।"

মনে মনে বাসুদেব বুঝতেই পারছিল, অসুবিধে তার যথেষ্ট হবে। উপায় কী।

"আমার আর কিসের অসুবিধে," বাসুদেব যেন তার অসুবিধে গ্রাহ্যই করছে না এমন ভাব করে বলল, "আমাদের তো অভ্যেসই রয়েছে। পটলবাবুর হোটেলে খাব আর দড়ির খাটিয়া টেনে উঠোনে শুয়ে পড়ব। আপনারই অসুবিধে হবে।...ভাল কথা, আপনাকে রেখে আমি একবার বাইরে যাব!"

"বাইরে?"

"কাছেই। বাজারে। স্টেশনের কাছেই বাজার।

মণিমালা চৌকাঠ ছেড়ে দু পা সরে এল। "বাজারে কেন?"

বাসুদেব হাসির মুখ করল। "পটলবাবুর হোটেলে।"

"হোটেল যে নেই শুনলাম এখানে?"

"না না, সে-রকম হোটেল নয়। পটলবাবুর চা-মিষ্টির দোকান, ওরই সঙ্গে আমাদের মতন দু চার জনের জন্যে ডাল ভাত রুটির ব্যবস্থা রেখেছে।"

মণিমালা বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বসল না।

বাসুদেব কি যেন মনে করে দেওয়াল-র‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেল পাজামা গেঞ্জি নামাল, তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, "আমি দু মগ জল ঢেলে নি, যা গরম। আপনার তো দেরি আছে।"

মণিমালা মাথা নাড়ল। কাছাকাছি কোথাও এঞ্জিনের হুইসেল বাজল আচমকা।

দরজার এক কোণে ছোট মতন একটা টুল। টুলের ওপর বাসুদেবের সাবান, টুথ পাউডারের কৌটো, দাড়ি কামাবার ভাঙা

কাপ, ব্রাশ! বাসুদেব সাবানটা তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

মণিমালা বিছানায় বসতে যাচ্ছিল কি মনে করে বসল না! জানলার দিকে তাকাল। বাইরের কিছু চোখে পড়ে না এখন, হয়ত সামনে গাছগাছালির আড়াল পড়েছে। অন্য জানলা দিয়ে সামান্য মাঠ, কাঁচা রাস্তার খানিকটা আর উঁচু ঢিবির মতন কি একটা চোখে পড়ে। গাড়ি যাবার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কাছাকাছি রেল লাইন। বোধ হয় ঢিবির ওপারে। ঢিমেতালে গাড়ি যাবার শব্দ আসছিল। মালগাড়ি হবে। শব্দটা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসতে আসতে কানের বাইরে চলে গেল। মণিমালা আবার অনুভব করল, মাথাটা শুধু ভার নয় ব্যথাও করছে। মাথা ধরেছে বেশ। মাথা ধরার রোগ মণিমালার বরাবরই। সঙ্গে অ্যাসপিরিন নেই, থাকলে খেয়ে নিত। অবসাদ লাগছে বড়।

অন্যমনস্কভাবে মণিমালা কপালে হাত দিল। রগের কাছটায় টিপে থাকল, দপ দপ করছে শিরা। বিছানায় বসল।

বেশী মাথা ধরলে বমির ভাব হয় মণিমালার। এখন অবশ্য বমি পাচ্ছে না, কিন্তু সমস্ত শরীরে কিসের এক অস্বস্তি! কাঁপছে না দুলছে? চোখ নাক জ্বলে যাচ্ছে যেন।

মাথায় আলগা খোঁপা ছিল। খুলে ফেলল মণিমালা। যেন চুল খুললে খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যাবে। আঁচলে কপাল মুছল।

বাইরে জল পড়ার শব্দ। বাসুদেব গা-মুখ ধুচ্ছে।

জলের শব্দে মণিমালা যেন নিজের শরীরের মালিন্য আরও বেশী করে অনুভব করল। একই জামা কাপড়ে দশ বারো ঘণ্টা। নাকি তার বেশীও হতে পারে। গাড়ির ধুলো ময়লা গায়ে যেন পুরু হয়ে জড়িয়ে আছে। সারাটা দুপুর কী অসহ্য গরম আর তাত। গলগল

করে ঘামতে হচ্ছিল।

বাইরে বাসুদেবের গলা পাওয়া গেল। কী-যেন বলল। খেয়াল করল না মণিমালা।

বোধ হয় উঠোন কিংবা বারান্দায় বাসুদেব। শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাইরে থেকেই বাসুদেব আবার বলল, "আমার হয়ে গিয়েছে।"

বসে থাকা অকারণ মনে হল মণিমালার। এই অস্বস্তি আর সহ্য করা যায় না। তেষ্টা পাচ্ছিল খুব। ঘরের চারদিকে তাকাল, জলের কুঁজোটুজো চোখে পড়ল না।

বাসুদেব জোরে জোরে কথা বলছিল, যেন ঘরের মধ্যে মণিমালা শুনতে পায়।

"এক টিন ভরতি জল আছে, আপনার হয়ে যাবে।"

মণিমালা বিছানা ছেড়ে উঠল। সুটকেসের চাবিটা ব্যাগের মধ্যে।

"এখানে দুপুরে যত গরম থাকে, রাত্তিরে থাকে না।"

সুটকেস খুলে মণিমালা শাড়ি জামা বার করে নিল। তোয়ালে সঙ্গে নিয়েছিল মনে করে। সাবান? নেওয়া হয় নি।

ডালা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল মণিমালা।

বাইরে এসে বলল, "খাবার জল নেই ঘরে?"

"জল? খাবেন?"

"বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।"

"দিচ্ছি।" বাসুদেব উঠোন ডিঙিয়ে একটা খুপরি ঘরের দিকে চলে গেল। হাতে লণ্ঠন।

ছিটকিনি খুলে ভেতরে ঢুকল বাসুদেব।

মণিমালা বারান্দায়। দমকা হাওয়া গায়ে লাগছিল। আরাম লাগার মতনই বাতাস। মাথার ওপর অনেকখানি আকাশ ছড়ানো।

গ্লাসে করে জল নিয়ে এল বাসুদেব। বাড়িয়ে দিল। "নিন।"

মণিমালা জল নিল। এক নিঃশ্বাসেই শেষ যেন। তেষ্টা মিটল না। আরও বেড়ে গেল, নিজেই বোঝে নি তার এত তৃষ্ণা।

গ্লাসটা ফিরিয়ে দিল না মণিমালা। নিজেই পা বাড়াল।

বাসুদেব বলল, "দিন না, আমার হাতে দিন।"

মণিমালা কান করল না, নিজেই ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল।

ফিরে এসে মণিমালা বলল, "ওটা কি রান্নাঘর?"

মাথা নাড়ল বাসুদেব। বলল, "হ্যাঁ।"

"কিছুই তো নেই। জলের কুঁজো, কেটলি আর দুটো বাটি ছাড়া।... ।"

বাসুদেব হাসল। হালকা সহজ হাসি। বলল, "রান্নাবান্নার পাট তো আমার নেই, কি আর থাকবে বলুন।"

"বাইরে বাইরেই খাওয়া-দাওয়া?"

"হ্যাঁ।...বাড়িতে এই একটু চা-টা করে খাই।"

"ঘরের কাজ?"

"একটা ছোঁড়া আছে। সকাল বিকেল জল তুলে, ঘরদোর ঝাট দিয়ে যায়।"

মণিমালা আর কিছু বলল না।

বাসুদেব বুঝতে পারছিল, কলঘরে যাবে মণিমালা! লণ্ঠনটা রান্নাঘরেই রাখা আছে।

উঠোন দিয়ে রান্নাঘরে যেতে যেতে বাসুদেব বলল, "আপনি সেরে নিন। আমি আছি। ফিরে এলে একবার বাইরে যাব।"

রান্নাঘর থেকে লণ্ঠন এনে বাসুদেব কলঘরের দিকে এগিয়ে গেল, ফিরে এল আলো রেখে। বলল, "রেল কোয়ার্টারের বাথরুম; আপনার খুব অসুবিধে হবে।"

মণিমালা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে উঠোনের অন্যপ্রান্তে চলে যেতে যেতে আবার দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে বিব্রত গলায় বলল, "একটু সাবান।"

"রেখে এসেছি," বাসুদেব বলল।

গা ধুয়ে শাড়ি জামা পালটে মণিমালার অনেক আরাম লাগছিল। মাথা ধরে আছে যদিও তবু ঠাণ্ডা জলের দরুন কপালের সেই জ্বালা আর তাপ ততটা নেই।

বাসুদেব পাশের ঘরে। কলঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় মণিমালা লক্ষ্য করেছিল, পাশের ঘরের দরজা খোলা। ভেতরে বাসুদেবের নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

শাড়ি জামা পালটে মণিমালা বাইরে এল।

বাসুদেব আবার উঠোনে। দেখল মণিমালাকে, বলল, "এবার আমি একটু বাইরে যাব। পটলবাবুর দোকানে। আপনি কী খাবেন বলুন?"

মাথা নাড়ল মণিমালা।

"খাবেন না? কেন? সারারাত উপোস করে থাকবেন?"

"ইচ্ছে করছে না।"

"তাই কি হয় নাকি?" বাসুদেব অনেকটা সপ্রতিভ হয়ে বলল, "কিছু না খেলে চলবে কেন? বিকেলে কিছু খেয়েছেন বলে তো মনে হয় না, তারপর সারা রাত উপোস!"

মণিমালা একটু চুপ করে থাকল। পরে বলল, "আমার খুব মাথা ধরেছে। কিছু খেতে পারব না। খেলেই শরীর খারাপ করবে।"

বাসুদেব বলল, "খিদে পেলেও মাথা ধরে। আর যদি ধরেই থাকে তো কি হয়েছে! আমি বাজারে যাচ্ছি, ছুটো ট্যাবলেট নিয়ে আসব।"

মণিমালা সামান্য স্বস্তি অনুভব করল। যাক মাথা ধরার ছুটো বড়ি সে পাবে তাহলে।

বাসুদেব যাবার জন্যে তৈরী। ছু পা এগিয়ে দাঁড়াল। বলল, "পটলবাবুর দোকানের রুটি তরকারি আপনি খেতে পারবেন না। আমি বরং মিষ্টিটিষ্টি নিয়ে আসি।"

মাথা নাড়ল মণিমালা। "না না, মিষ্টি নয়।"

"সে আমি বুঝব," বাসুদেব বলল, "আপনি আমার অতিথি, বাড়িতে এসে উঠেছেন।" বলে প্রায় সদর পর্যন্ত এগিয়ে আবার দাঁড়াল। "আপনার ভয় করবে না তো?"

মণিমালা চারপাশে তাকাল। সবই ফাঁকা।

"এখানে ভয়ের কিছু নেই," বাসুদেব বলল, "এই কোয়ার্টারটা ফাঁকা তবে আশেপাশে লোক আছে। একটু তফাতেই কুলি কোয়ার্টার। আপনার ভয় পাবার কিছু নেই।"

বাসুদেব সদর খুলে চলে যাবার সময় দরজা বন্ধ করে দিতে বলল।

মণিমালা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ; তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সদর বন্ধ করল।

এত ফাঁকা, নিঝুম বলে কেমন একটা অস্বস্তি হলেও মণিমালার ভয় করছিল না।

বাইরে বারান্দায় লণ্ঠনটা জ্বলতে লাগল। ঘরে এল মণিমালা। জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মিহি জ্যোৎস্নায় সামনের টিবিটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওপারে চোখ যায় না। মণিমালার মনে হল, তার চোখের সামনে এই রকম কিসের এক আড়াল বরাবর থেকে গেল। কেন, কে জানে!

তিন

সকালে ঘুম ভেঙে উঠে বাসুদেব দেখল, তখনও রোদ ওঠে নি।

দড়ির খাটিয়ার ওপর উঠে বসতেই মণিমালাকে দেখতে পেল। বারান্দার ধারে বসে আছে।

প্রথমটায় যেন বুঝতে পারে নি, স্বপ্নের মতন লাগল, পরমুহূর্তে বুঝতে পারল।

বড় বড় হাই তুলে বাসুদেব ঘুমের আলস্য কাটাবার চেষ্টা করল। মণিমালার দিকে তাকাল। হাসল। "আপনি অনেকক্ষণ উঠেছেন?"

মণিমালা হাসির মুখ করল, বলল, "খানিকটা আগে।"

"ঘুম হয়েছিল রাত্তিরে?"

কোনো জবাব দিল না মণিমালা। এই সাত সকালে তার মুখ অন্যরকম দেখাচ্ছিল, কালকের মতন নয়। কাল ওই মুখ অনেক বিহ্বল, অনিশ্চিত, উদভ্রান্ত ছিল। আজ অতটা নয়। বাসী, সামান্য শুকনো মুখ। কিন্তু বিহ্বল নয়। এমন কি মণিমালার চোখ তেমন শূন্য, উদাসও দেখাচ্ছিল না।

বাসুদেব উঠে পড়ল, খাটিয়াটা সরিয়ে দিল একপাশে।

"আপনার খুব গরম লেগেছিল, না ?" বাসুদেব উঠোনে নামল।

"না তেমন নয়।"

"আমরা গরমের দিন বাইরে খাটিয়া পেতে শুই। বাইরে ভীষণ আরাম।"

মণিমালা বাসুদেবের দিকে তাকাল। কি মনে করে হালকা গলায় বলল, "দেখলাম। নাক ডাকছিল।"

বাসুদেব হেসে ফেলল। ঘুমিয়ে নাক ডাকানোর অভ্যেস তার নেই। কথাটা ঠাট্টা করেই বলা।

চোখে না পড়লেও বোঝা যাচ্ছিল, সূর্য উঠে আসছে।

বাসুদেব বলল, "আমার মনে হচ্ছিল, রাত্তিরে আপনি ঘুমোতে পারবেন না। নতুন জায়গা। কানের কাছে গাড়ির শব্দ ! তার ওপর ওই বিছানা।"

মণিমালা গায়ের কাপড় গুছিয়ে নিল, মাথায় কাপড় নেই, কাঁধ পর্যন্ত চুল ছড়ানো। বলল, "আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। কার বিছানা, কে শোয়। বাড়ির লোককেই আমি বাইরে বার করে দিয়ে নিজে দিব্যি শুয়ে আছি।"

"আরে না না, বার করবেন কেন, আমি তো বাইরেই শুই গরমে। খাটিয়াটা কি সাধে পড়ে আছে ?"

মণিমালা কিছু বলল না। নিজেকে কুণ্ঠিত মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বাসুদেবের ঘর, বিছানা সে প্রায় বোলো আনাই অধিকার করে নিয়েছে। রাত্রে শোবার সময় [illegible] একটা সতরঞ্চি ছাড়া আর কিছু পায় নি। নেয় নি। কপাল ভাল যে, দুটো ছোট ছোট বালিশ ছিল, নয়ত বাসুদেব বালিশ পেত না।

বাসুদেব সদর দরজা খুলতে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, "চায়ের

জল চাপিয়ে দি, কি বলেন। আপনি মুখটুখ ধুয়ে নিন।”

মণিমালা কিছু বলার আগেই বাসুদেব পাশের ঘরের দরজা খুলল। তালা ছিল পলকা। দরজা খুলে বাসুদেব ঘরে ঢুকল।

উঠোনে পা দিয়ে মণিমালা বসেই থাকল। কাল যা কিছু নজরে পড়েছে সবই অস্পষ্ট, বোঝা যায় নি। আজ সবই চোখে পড়ছে। ছোট উঠোন সিমেণ্ট বাঁধানো, চিড় ধরেছে দু-এক জায়গায়। উঠোনের বাঁ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা কচি ডালিম গাছ। একটু ঝোপের মতন দেখায় তারই কাছাকাছি নিচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কলঘর। পলকা দরজা।

উঠোনের অন্য প্রান্তে খুপরি রান্নাঘর। উঠোন যতটুকু, বারান্দাও ততটুকু। তবে সরু। পাশাপাশি দুটো ঘর। পাশের ঘরটা কেমন তা অবশ্য মণিমালা দেখে নি।

পাশের ঘরে কিসের যেন আওয়াজ উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মণিমালা। স্টোভ জ্বেলেছে বাসুদেব।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেব বাইরে এল। হাতে একটা কলাইকরা মগ। রান্নাঘরের দিকে এগুতে এগুতে বাসুদেব বলল, “মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই জল ফুটে উঠবে। আপনি মুখটুখ ধুয়েছেন?”

মণিমালা বাসুদেবের তৎপরতা দেখছিল। সকৌতুকে।

রান্নাঘর থেকে কেটলিতে জল ভরে এনে বাসুদেব আবার ঘরে গেল।

মণিমালা উঠল। উঠোনে রোদ নামছে। এক জোড়া কাক এসে বসল পাঁচিলে।

কলঘরের দিকে গেল না মণিমালা। বারান্দা দিয়ে পাশের ঘরে এসে দাঁড়াল।

চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছে বাসুদেব। স্টোভ জ্বলছে শব্দ করে। ঘরের জানলা খোলা। একটি মাত্র জানলা এ-ঘরে। রোদ আসে নি, আলো এসেছে।

মণিমালা ঘরটা লক্ষ্য করছিল। একপাশে স্টোভ, চায়ের দুটো কাপ, কাচের গ্লাস, গোটা দুই তিন কৌটো—বোধহয় চা চিনি রাখার, কনডেন্সড মিল্কের টিনের ওপর একটা কানা ভাঙ্গা প্লেট উপুড় করে রাখা। বাসুদেব স্টোভের সামনে উবু হয়ে বসে আছে।

ঘরের মধ্যে দেখার মতন আর বিশেষ কিছু নেই। একপাশে কাঠের এক বিরাট বাক্স, জলচৌকি একটা আর ছেঁড়া ফাটা এক লুঙ্গি।

মণিমালার পায়ের শব্দে বাসুদেব মুখ ফিরিয়েছিল। কিছু যেন বলতে গেল।

দু পা এগিয়ে এসে মণিমালা বলল, "আমি চা করছি।"

বাসুদেব মাথা নাড়ল জোরে জোরে। "না না, আপনি কেন? আমি করছি। এই তো হয়ে এল।"

কথা কানে তুলল না মণিমালা। মাটিতেই বসে পড়ল। বলল, "আমিই করছি।"

বাসুদেব আবার আপত্তি করল। নিজের হাতে সে রোজ চা করে খাচ্ছে, ব্যাপারটা তার কাছে কিছুই নয়।

মণিমালা হাত বাড়িয়ে সামনে রাখা কৌটোগুলো তার দিকে টেনে নিতে লাগল, যার অর্থ চা মণিমালাই করবে।

অগত্যা বাসুদেব উঠে পড়ল। "আমি তা হলে মুখটা ধুয়ে নিই।"

স্টোভ, চায়ের কেটলি, চা চিনির কৌটো আর অন্য কোনো

ভাবনা নিয়ে বসে থাকল মণিমালা।

বাইরে বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে বাসুদেব বলল, "চা জুড়িয়ে যাচ্ছে আপনার।"

মণিমালা উঠোনে। মুখ ধুয়ে আঁচলে চোখ মুছছিল। রোদ নেমে যাচ্ছে উঠোনে।

বাসুদেবের কাছাকাছি মণিমালা বসল। তার চা রেখে গিয়েছিল ঢাকা দিয়ে।

"দারুণ হয়েছে", বাসুদেব হাসি মুখে বলল, "আমার হাতে এই টেস্ট হত না।"

চায়ে ধীরেসুস্থে চুমুক দিল মণিমালা। হাসল যেন।

খোলা সদর দিয়ে একটা বেড়াল ঢুকে পড়েছিল। উঠোনে অলস-ভাবে পাক খেল। ডাকল বার কয়েক তারপর চলে গেল।

চা খেতে খেতে মণিমালা প্রায়ই বাসুদেবের মুখ দেখছিল। কিছু যেন বলবে। অথচ বলছিল না।

বাসুদেব হঠাৎ উঠল। দড়ির খাটিয়ার বালিশের তলায় তার সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই। সিগারেটের প্যাকেট হাতে আবার ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসল। তার চা প্রায় শেষ।

চাটুকু শেষ করে বাসুদেব একটা সিগারেট ধরাল। "আর একটু বেশী করে জল বসালে হত। এক কাপে ঠিক পোষাল না।" বলে হাসল, জোরে-জোরেই।

মণিমালা হাসির চোখ করে তাকাল, হাল্কা গলায় বলল, "চায়ের নেশা বুঝি ?"

"নেশা। না, ঠিক নেশা নয়, তবে দিনে কম করেও দশ বারো বার

হয়ে যায়। আমাদের ব্যাপার তো, ডিউটিতে থাকলেই বেশী হয়ে যায়।”

“আজ কখন ডিউটি ?”

“সেই বারোটা আটটা।” বলেই বাসুদেব মণিমালাকে দু পলক দেখল। তারপর ইতস্তত করে বলল, “আপনি তা হলে কি ঠিক করলেন ?”

মণিমালা কথা শেষ করতে দিল না বাসুদেবকে। বলল, “একটা কথা বলব ?”

তাকিয়ে থাকল বাসুদেব।

সামান্য চুপ করে থেকে মণিমালা বললে, “এখানে কোনো থাকার জায়গা পাওয়া যায় না ?”

বাসুদেব মণিমালাকে লক্ষ্য করতে করতে মাথা নাড়ল। “না। এখানে থাকার জায়গা কই ?”

“ঘর বাড়ি নেই এমন জায়গা নাকি ?”

“না, আছে। তবে খুব কম। যে যার নিজের বাড়িতে থাকে, ফাঁকা বাড়ি কোথাও আছে কিনা আমি জানি না।” বলে বাসুদেব সামান্য চুপ করে থাকল, তারপর বলল, “আপনি এখানে থাকবেন কেন মিছেমিছি ?”

মণিমালা অন্যমনস্ক ভাবেই বলল, “থাকলে ক্ষতি কিসের। লোকে বেড়াতে গিয়ে কোথাও থাকে না দু পাঁচ দিন ?”

বাসুদেব মাথা নাড়ল। “আপনি তো বেড়াতে আসেন নি। এখানে এমনিতে বড় কেউ বেড়াতেও আসে না।”

মণিমালা জবাব দিল না কথার। উঠোনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। মুখ যেন সামান্য ম্লান।

বাসুদেব সিগারেটটা নতুন করে ধরাল, নিভে গিয়েছিল। হয়ত সামান্য বিরক্ত, ঈষৎ চঞ্চলও হয়েছে। বলল, "আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না, দিদি। আমার ভীষণ অবাক লাগছে। আপনি কোথা থেকে আসছেন? কেন আসছেন? হঠাৎ কেন ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন? আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।"

মণিমালার মুখ গম্ভীর ম্লান হয়ে উঠল। চোখ কেমন উদাস। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না।

সদর দিয়ে অল্প বয়েসী একটা ছেলে ঢুকল। কেমন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল উঠোনে। মণিমালাকে দেখছিল।

বাসুদেব ছেলেটাকে বলল, "পানি ভর দে আগাড়ি। পুরা ভরবি। বাদ ঝাড়ু লাগানা।"

ছেলেটা আরও একটু দাঁড়িয়ে থেকে কলঘরের দিকে চলে গেল।

"এ বাবু?"

"কিয়া?"

"কাপড়া কাঁহা রাখি?"

বাসুদেবের খেয়াল হল, মণিমালা কাল রাত্রে জামা কাপড় ছেড়ে কলঘরেই ফেলে এসেছে।

"আপনার কাপড় টাপড় ও কেচে দেবে নাকি?" বাসুদেব বলল মণিমালাকে।

মণিমালা অন্যমনস্ক ছিল। তাকাল। বলল, "থাক, আমি কেচে নিচ্ছি।"

"তু রাখ দে—" বাসুদেব ছেলেটাকে বলল, "পানি ভর দে।"

বালতি হাতে বেরিয়ে এল ছেলেটা, সদর দিয়ে চলে গেল বাইরে।

কি বলবে না বলবে করে বাসুদেব বলল, "এই বেটাই আমার কাজকর্ম করে দেয়। বেটার নাম কি জানেন? কানাইয়ালাল। আমাদের স্টেশনের রামলগনের ভাইপো।"

মণিমালা কোনো কথাই বলল না। সামান্য ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে বাসুদেবের চায়ের কাপটা টেনে নিল।

বুঝতে পারে নি বাসুদেব। "আরে আরে, ও কি করছেন?"

"ধুয়ে রাখি।"

"না না, আপনি ধোবেন কেন? রেখে দিন। কানাইয়া ধুয়ে দেবে।"

কথার জবাব দিল না মণিমালা। চায়ের কাপ দুটো উঠিয়ে নিয়ে কলঘরের দিকে চলে গেল।

বাসুদেব বুঝতে পারল, মণিমালা অন্যমনস্ক। কি যেন ভাবছে।

আরও খানিকটা বেলা হয়ে গিয়েছিল।

বাসুদেব কোয়ার্টারে ছিল না, বাইরে কোথাও বেরিয়েছিল। ফিরে এল শালপাতার ঠোঙ্গা হাতে। এসে দেখল, উঠোনের তারে শাড়ি, জামা সায়া শুকোচ্ছে মণিমালার। কেমন যেন লাগল চোখে। এ-বাড়িতে শাড়ি শুকোলো এই প্রথম। বাসুদেবের মজা লাগছিল। বাতাসে শাড়ি উড়ছে। ফিকে সোনালী-হলুদ রঙ। জমজমে পাড়।

মণিমালা বাইরে নেই। কানাইয়ালাল কাজকর্ম চুকিয়ে ফেলেছে প্রায়।

বাসুদেব দরজার কাছে গিয়ে মণিমালাকে ডাকল, "দিদি?"

ভেতরে ছিল মণিমালা। সাড়া দিল, মৃদু গলায়।

ঘরে এসে বাসুদেব বলল, "সকালে কিছু পেটে পড়া দরকার। জিলিপি আর কুচো নিমকি নিয়ে এসেছি। আসুন। আর একটু

আগে গেলে একেবারে গরম জিলিপি পাওয়া যেত।" বাসুদেব শাল-পাতার ঠোঙ্গাটা বাড়িয়ে দিল।

মণিমালা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। কাল রাত্রে সে বাইরের কোনো কিছুই স্পষ্ট করে দেখতে পায় নি। আজ সকালে সবই স্পষ্ট। টেবিলের গায়ে গায়ে যে জানলাটা সেটা খোলা থাকলে একটা বিশাল তেঁতুলগাছ, কাঁকর আর মাটি ছড়ানো সরু রাস্তা চোখে পড়ে। সামান্য তফাতে উঁচু ঢিবি মতন, তার আড়ালে রেল লাইন। ও-পাশের জানলা দিয়ে তাকালে এক টুকরো মাঠ, মাঠের ও-পারে তিন চার ঘরের কুলি কোয়ার্টার, ইদারা, কচি অশ্বত্থ গাছ আরও কিছু কিছু নজরে আসে।

মণিমালা বড় জানলার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল, রাস্তা দেখছিল। বাসুদেব ঘরে ঢোকার পর সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

হাত বাড়াল না মণিমালা। বলল, "আমি খাব না, ভাই।"

"কেন, কেন" বাসুদেব সরাসরি দেখছিল মণিমালাকে।

"আমার খিদে নেই।"

"কি যে বলেন, খিদে নেই। কাল রাত্তিরে কিছুই তো মুখে দিলেন না। আসুন, খেয়ে নিই। সীতারাম দারুণ জিলিপি করে।"

"আপনি খান না।"

"আপনাকে মুখের সামনে বসিয়ে? তাই কি হয় নাকি। আপনার জন্যেই তো আনলুম।"

মণিমালা যেন বাধ্য হয়েই হাত বাড়াল।

বাসুদেব বলল, "আপনি শুরু করুন। আমি স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল বসিয়ে আসছি। এবার কিন্তু আমি চা করব।"

চলে গেল বাসুদেব।

শালপাতার ঠোঙ্গা হাতে দাঁড়িয়ে থাকল মণিমালা। কুলি কোয়ার্টারের ওদিকে নানান ধরনের গলা। রাস্তা দিয়ে সাইকেল যাচ্ছে। কোথাও একটা কোকিল ডাকছে অনেকক্ষণ থেকেই।

মণিমালা টিনের চেয়ারের ওপর শালপাতার ঠোঙ্গাটা রাখল। রেখে বাইরে গেল।

ঘরে বসে চা জিলিপি খাওয়া চলছিল।

বাসুদেব বলল, "আমার ওপর আপনি রাগ করেছেন?"

মণিমালা অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল। "না, রাগ করব কেন।"

কুচো নিমকি চিবুতে লাগল বাসুদেব। বার বার মুখ দেখছিল মণিমালার। তার কিছু মাথায় আসছিল না।

"এখানে থাকার জায়গা সত্যিই নেই" বাসুদেব শান্ত সরল গলায় মণিমালাকে বোঝানোর মতন করে বলল, "ঘর বাড়ি খুবই কম। বাঙালী পাঁচ দশ ঘর মাত্র। আপনাকে কোথায় থাকার ব্যবস্থা করে দেব বলুন।"

মণিমালা তাকাল। "আমার চলে যাওয়াই ভাল।"

অস্বস্তি বোধ করল বাসুদেব।

"এ তো রাগ করে বলছেন," বাসুদেব হাসির মুখ করল। "আসল ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন না। ধরুন কোথাও একটা থাকার জায়গা জোগাড় করা গেল, আপনি একা থাকবেন কেমন করে? আপনার থাকা, শোওয়া, খাওয়া—সবেরই অসুবিধে হবে। কোথায় পাবেন বিছানাপত্তর, খাওয়া-দাওয়া করবেন কোথায়?" বলে একটু থেমে আবার বলল, "আমরা পুরুষ মানুষ, আমরা রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়েও দু একটা দিন কাটাতে পারি। আপনি মেয়ে, আপনি কেন

পারবেন ?”

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না মণিমালা। পরে বলল, “তা ঠিক, মেয়ে হবার অনেক জ্বালা···আমি কি চলে যাব ?”

“সেটা আপনার ইচ্ছে। তবে এখানে থাকবেনই বা কেন? ফরনাথিং এখানে—”

“না, আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।”

বাসুদেব একটু চুপচাপ থাকল। বলল, “কলকাতায় ফিরবেন ?”

“আমি তো বলি নি কলকাতায় আমার বাড়ি।”

বাসুদেব বিমূঢ় বোধ করল। “না, আপনি বলেন নি, আমি ভেবেছিলাম।” বলে কেমন যেন অসহায়ের মত জানলার দিকে তাকাল। তারপর আবার মণিমালার দিকে। ইতস্তত করল। “আপনার টিকিট ছিল কলকাতার। হাওড়া টু মোগলসরাই।”

মণিমালা কোনো জবাব দিল না কথার।

অপেক্ষা করে বাসুদেব আবার বলল, “কিছু মনে করবেন না। আপনি কি রাগারাগি করে বাড়ি থেকে চলে এসেছেন ?”

মণিমালা উঠে দাঁড়াল। “আমার কথা থাক। আমি তো বললাম, চলে যাব।”

বাসুদেব বিরক্ত হল। প্রকাশ করল না। “কিন্তু কোথায় ?”

“জানি না। ভেবে দেখি নি।”

“বাঃ। ছেলেমানুষের মত কথা বলছেন।”

মণিমালা কথা বলল না।

বাসুদেব অধৈর্য হল। “আপনি এ-ভাবে চলে গেলে আমি ঝামেলায় পড়ব।”

“ঝামেলা ? কেন ?”

"বাঃ, আপনি এলেন, আমার এখানে একটা রাত কাটালেন। এরপর যখন কেউ খোঁজ করতে আসবে, আমি কী বলব?"

মণিমালা ঠাণ্ডা গলায় বলল, "কেউ আসবে না।"

"তাই কি হয় নাকি? নিশ্চয় কেউ আসবে। বাড়ির লোক।"

"না, মণিমালা মাথা নাড়ল। বাড়ির লোক কেউ আসবে না।"

বাসুদেব খুশী হল না। "আপনি এ-ভাবে চলে গেলে আমার দুশ্চিন্তা বাড়বে। হঠাৎ এলেন, হঠাৎ চলে গেলেন। কোথা থেকে এসেছিলেন তাও জানলাম না, কোথায় যাবেন তাও নয়। তারপর ধরুন, কোনো একটা আপদ-বিপদ হল আপনার, তখন?"

মণিমালা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরের দিকেই তাকিয়ে থাকল। আবার একটা গাড়ি আসছে। হুইসল বাজছিল।

মণিমালা বলল, "অজানা অচেনা একটা মেয়েকে আপনি একটা দিন আশ্রয় দিয়েছেন। না দিলে কী করতাম জানি না। আপদ-বিপদ যদি হয় আপনার আর কি করার আছে।"

বাসুদেব অসহিষ্ণু, বিরক্ত, অসন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকল। মহিলা স্বাভাবিক নয়। জেদাজেদি, রাগ, ঝগড়া করে পাগলামীর মাথায় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। কে বলতে পারে, আজ কিংবা কাল কেউ তার খোঁজ করতে আসবে না। আসতেই পারে। আসা স্বাভাবিক। মহিলা যা বলছেন, সব বিশ্বাস করার কারণ নেই। বাড়ির লোক কি খোঁজখবর করবে না?

বাসুদেবের মনে হল, মহিলাকে হুট করে চলে যেতে দেওয়া উচিত হবে না। কোথায় চলে যাবেন, তারপর কোথায় গিয়ে পড়বেন —কে জানে।

মণিমালা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, বাসুদেবের দিকে সরাসরি তাকাচ্ছে না।

বাসুদেব ভাবছিল। কি মনে করে বলল, "কাল আপনি বলছিলেন, আমায় বিশ্বাস করেছেন। আজ কিন্তু আর করছেন না।" বলে একটু হাসল।

মণিমালা মুখ ফেরাল। "কেন?"

"এটা বিশ্বাসের নমুনা নয়, দিদি। আমায় আপনি কিছুই বলছেন না।"

মণিমালা দু পলক দেখল বাসুদেবকে। চোখ সরিয়ে নিল। মৃদু গলায় বলল, "বলার কিছু নেই।"

"আপনি কিন্তু ছেলেমানুষী করছেন। এ-ভাবে কেউ বাড়ি ছেড়ে চলে আসে না।"

কথার কোনো জবাব দিল না মণিমালা।

অপেক্ষা করে বাসুদেব আবার বলল, "আপনি কোনো বিপদে পড়ুন এটা আমি চাই না, দিদি। দিনকাল বড় খারাপ আজকাল। ঝোঁকের মাথায় কোথাও চলে গেলে ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় পড়ে যেতে পারেন।"

মণিমালা সবই শুনল, শুনেও অবুঝের মতন বলল, "আমার কপালে যা আছে তাই হবে। অত আর ভেবে কি করব।"

এমন অবুঝ, জেদী, একগুঁয়ে স্বভাবের মেয়ে আর যেন দেখে নি বাসুদেব। কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, মহিলার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা রয়েছে। এমন নির্বোধের মতন কাজ করছেন যাতে পাগল ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

জানলা থেকে সরে মণিমালা তক্তপোশের কাছে গেল। বসল।

বসে সুটকেসটা টানল খাটের তলা থেকে।

"আমি তো আশ্রমেও যেতে পারি," মণিমালা বলল।

"আশ্রম? এখানে আশ্রম কোথায়?"

"ওই ছেলেটা তো বলল, আছে ঝটিয়াগাঁও। বাসে করে যেতে হয়।"

বাসুদের যেন আঁতকে উঠল। "কানাইয়া বলেছে। বেটার তো খুব বুদ্ধি। · হ্যাঁ, আশ্রম আছে। মাইল পনেরো যেতে হয় বাসে। সেটা কিন্তু কুষ্ঠাশ্রম, লেপার অ্যাসাইলাম। আপনি কি কুষ্ঠাশ্রমে, যেতে চান নাকি?"

মণিমালা ঘাড় ফেরাল। বলল, "হ্যাঁ।"

বাসুদেব চমকে গেল, বলে কি মণিমালা? কুষ্ঠাশ্রমে যাবে? থতমত খেয়ে বোকার মতন তাকিয়ে থাকল বাসুদেব।

বলল, "কেন?"

বলতে চাইছিল না মণিমালা। তবু বলল, "একজনের খোঁজ করব।"

"আপনি তো আগে সে-কথা বলেন নি। আশ্রম আশ্রম বলছিলেন!"

মণিমালা মৃদু গলায় বলল, "আমার ভুল হয়েছে। ভাবছিলাম কুষ্ঠ আশ্রম শুনলে আপনি কিছু মনে করেন।"

বাসুদেব অবাক হয়ে দেখছিল মণিমালাকে। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মণিমালা।

চার

বাসুদেবের ডিউটি বেলা বারোটা থেকে। দাড়ি কামিয়ে স্নান সারতে প্রায় এগারোটা বেজে গেল। আকাশ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

মণিমালা কোথাও যাচ্ছে না। সকালে যাবার কথা উঠেছিল, বাসুদেব যে ব্যস্ত বিরক্ত হয়ে কথাটা তুলেছিল তাও নয়, স্বাভাবিক-ভাবেই উঠেছিল, তারপর সে নিজেই কেমন অপ্রস্তুত হয়ে চাপা দিল প্রসঙ্গটা। মণিমালাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে বাসুদেব—এটা ভাবা উচিত নয় মণিমালার। একটা রাত যদি কেটে গিয়ে থাকে মণিমালা এক-আধ দিন আরও থেকে গেলে বাসুদেবের কিই বা ক্ষতি হবে।

তাছাড়া, মণিমালা কুষ্ঠাশ্রমের কথা তুলে বাসুদেবকে একেবারে বোকা করে দিয়েছে। কাল যা মনে হয়েছিল এবং আজ সকালের দিকে—কুষ্ঠাশ্রমের কথা শোনার পর তা আর মনে হচ্ছে না। নিছক খেয়ালের মাথায় কিংবা পাগলামী করে মণিমালা যে এখানে নেমে পড়েছে তা হয়ত নয়। তার কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। কী উদ্দেশ্য বাসুদেব বুঝতে পারছে না।

মণিমালাকে প্রথমটায় অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, জেদী এবং নির্বোধ মনে হয়েছিল বাসুদেবের। মনে হয়েছিল, মহিলা পরিণাম না ভেবেই ঝোঁকের মাথায় বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছেন। এখন আর তা মনে হচ্ছে না। মণিমালার মধ্যে গোপন কিছু রয়েছে।

বাসুদেব কৌতূহল বোধ করছিল।

অফিস বেরুবার সময় বাসুদেব বলল, "আমি পটলবাবুর দোকানে ভাত খেয়ে অফিস চলে যাব। আপনার খাবার বাড়িতেই দিয়ে

যাবে আমি বলে রেখেছি। কোনো অসুবিধে হবে না। কানাইয়াকে বলবেন, দোকানের টিফিন কেরিয়ারটা ধুয়ে মুছে বিকেলে যাতে দোকানেই দিয়ে আসে।"

ছাতা মাথায় দিয়ে বাসুদেব বেরিয়ে গেল।

মণিমালা একা। বাইরে খাঁ খাঁ রোদ। উঠোন বারান্দা তেতে পুড়ে যাচ্ছে। ডালিম ঝোপের পাতাগুলো শুকিয়ে এল। কাছাকাছি একটা কাকও ডাকে না।

বাইরে বেরুবার উপায় নেই। ঘরেই থাকল মণিমালা। জানলাও খুলে রাখা যায় না, লু বইছে গোঁ গোঁ করে।

সারাটা দুপুর ঘরে বসে বসে মণিমালা যেন পুড়ল।

বিকেলে জানলা খুলে দিল মণিমালা। বড় জানলার দিকে ছায়া নেমেছে। বাইরের বাতাসে তখনও হলকা। তবু সামান্য আরাম লাগছিল। কানাইয়া এল বিকেলের গোড়ায়।

কাজকর্ম সেরে, জল তুলে কানাইয়া চলে যাচ্ছিল মণিমালা বলল, "ওটা নিয়ে যাবি না?" টিফিন কেরিয়ারটা বারান্দায় নামানো ছিল।

টিফিন কেরিয়ারটা কানাইয়ার হাতে তুলে দিয়ে মণিমালা বলল, "বাজার কত দূর রে?"

"নাগিচ।"

"আমায় ক'টা জিনিস এনে দিবি?"

মাথা হেলাল কানাইয়া।

মুখে বললে বুঝবে না কানাইয়া। একটা পেন্সিল পড়ে ছিল টেবিলে, এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে মণিমালা ক'টা জিনিসের নাম

লিখল।

টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিল কানাইয়াকে।

চৈত্রের আলো সহজে মরে না। গরম কিন্তু পড়তে শুরু করল। বাতাসের গরম কাটছিল ধীরে ধীরে।

কানাইয়া ফিরে এল। তার গামছাটা পুঁটলির মতন করে বাঁধা। সওদা বেঁধে এনেছে।

মণিমালা একটা টাকা দিল কানাইয়াকে।

কানাইয়া একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল প্রথমে। তারপর মহাখুশী।

হঠাৎ কানাইয়া বলল, "তু কোন হো মাজী?"

মণিমালা প্রথমটায় বুঝতে পারে নি। পরে বুঝল। হেসে বলল, "দিদি।"

কানাইয়া যেন বুঝে নিল। "ছেদিবাবুকা দোকান মে পুছলা থা। হাম কহল কি মাজীকা সওদা।"

চলে গেল কানাইয়া।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। মণিমালা বাতি জ্বালাল ঘরের। তারপর গা ধুতে গেল।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই মণিমালা বুঝতে পারল বাসুদেব এসেছে। সদর খুলে দিল মণিমালা।

ভেতরে এসে বাসুদেব বলল, "আজ একেবারে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িয়ে দিয়েছে। কী গরম। আমি ভাবছিলাম আপনি আছেন কেমন করে?"

উঠোনে এসে দাঁড়াল বাসুদেব। হাত কয়েক তফাতে মণিমালা।

খাটিয়াটা উঠোনে নামানো। সতরঞ্জি পাতা। বালিশ অবশ্য নেই। বোঝা যায় মণিমালা উঠোনেই বসে ছিল। এক পাশে তার

শাড়ি জামা মেলা রয়েছে।

"খাটিয়াটা কে নামাল? আপনি?"

মণিমালা হাসল। "কেন, আমি কি পারি না?"

বাসুদেব হাসল। "বেশ করেছেন। বাইরে বসেই এখন আরাম। ...দুপুরটা কেমন ছিল আর এখন কেমন হয়ে গেছে বলুন!"

এখন সেই এলোমেলো হাওয়া। গরম ভাবটাও নেই। আকাশে জ্যোৎস্না ফুটে আছে। কালকের চেয়ে সামান্য উজ্জ্বল।

মণিমালা বলল, "স্টোভটা একটু ধরিয়ে দিন। চা করি।"

বাসুদেবের খেয়াল হল। বলল, "এই রে, বিকেলে আপনার আর চা খাওয়া হয় নি। কানাইয়াকে বললেন না কেন, এক ছুটে গিয়ে দোকান থেকে এনে দিত।"

মণিমালা ঠাট্টার গলায় বলল, "আপনার জন্যে বসেছিলাম। একসঙ্গে খাব।"

বাসুদেব হাসল। হেসে স্টোভ ধরাতে ঘরে ঢুকল।

মণিমালা প্রায় পিছু পিছু এল। বলল, "স্টোভটা ধরিয়ে আপনি গা-মুখ ধুয়ে নিন, আমি চা নিয়ে আসছি।"

স্টোভ ধরিয়ে দিল বাসুদেব। বলল, "পাম্পের ওয়াশারটা খারাপ হয়ে গেছে। রোজ ভাবি পালটে নেব, কুড়েমি করে আর হয় না। কাল হাত লাগাব।"

মণিমালা কেটলি নিয়ে বসল। বাসুদেব গেল স্নান করতে।

স্নান সেরে পাজামা আর গেঞ্জি পরে বাসুদেব উঠোনে খাটিয়ায় বসেছিল মণিমালা চা এনে দিল। চায়ের সঙ্গে কাচের ডিশে করে মিষ্টি।

"এ আবার কি?" বাসুদেব অবাক হয়ে বলল, "মিষ্টি কোত্থেকে এল?"

"অত জানার দরকার কি, খান।" মণিমালা দাঁড়াল না। নিজের চা আনতে গেল।

জলের গ্লাস আর চা নিয়ে একটু পরেই ফিরল মণিমালা। জল মাটিতে নামিয়ে রেখে খাটিয়ার অন্য পাশে বসল।

বাসুদেব মিষ্টি খেতে খেতে বলল, "আপনি আনিয়েছেন।"

"না, একজন এসে দিয়ে গেছে," মণিমালা মুখ টিপে হাসল।

"এ বড় অন্যায়। আপনি এ-সব কেন আনাচ্ছেন?"

"দু বেলা আপনিই বা আমায় খাওয়াচ্ছেন কেন?···আজ আপনার পটলবাবু দই-টইও পাঠিয়ে ছিলেন খাবারের সঙ্গে। পানও ছিল।"

প্রচ্ছন্ন পরিহাসটা বাসুদেব বুঝতে পারল। দই এবং পানের ব্যবস্থা তার। পটলবাবুকে বলে দিয়েছিল পাঠাতে।

বাসুদেব বলল, "আপনি কি নিজেই বাজার দেখতে বেরিয়ে ছিলেন?"

"না। কানাইয়াকে পাঠিয়ে ছিলাম।"

বাসুদেব মিষ্টি শেষ করে জল খেল। তারপর চায়ের কাপ তুলে নিল মাটি থেকে।

দু জনেই চুপচাপ।

সামান্য পরে বাসুদেব বলল, "সকালে আপনি কুষ্ঠাশ্রমের কথা বলছিলেন। কী ব্যাপার বলুন তো।"

মণিমালা ধীরেসুস্থে চা খাচ্ছিল। কখনও উঠোন দেখছে, কখনও মাথা তুলে আকাশ, কখনও বা বাসুদেবকে।

কথার জবাব দিল না মণিমালা। পরে বলল, "আমি একটা কথা বলব?"

“কেন বলবেন না, বলুন।”

মণিমালা নরম, মৃদু গলায় বলল, “আপনি তো আমাকে দিদি বলেছেন, আমি যদি তুমি বলে কথা বলি রাগ করবেন ?”

বাসুদেব সামান্য অবাক হল। “না না, রাগ করব কেন। আপনি তো আমার চেয়ে বয়েসে বড়। দিদির মতন।”

মণিমালা বড় মধুর করে হাসল, বলল, “তোমাকে আপনি বলতে আমার ভাল লাগছিল না।”

“বলবেন না। তুমি বললে কি আমার সম্মান কমবে।” বাসুদেব হাসল জোরে জোরে।

মণিমালা কয়েক পলক শান্ত প্রসন্ন চোখে বাসুদেবকে দেখল। বলল, “তোমার সঙ্গে আমার একটা স্পষ্টাস্পষ্টি কথা হোক।”

বাসুদেব বড় করে চুমুক দিল চায়ে। “বলুন, কী কথা ?”

“আমার ঘর বাড়ির কথা তুমি আমায় জিজ্ঞেস করবে না।··· আমি তোমায় বিপদে ফেলব না, জব্দ করব না। তোমার এখানে আমি থাকলে অনেক অসুবিধে তোমার। এক দু দিন থাকতে দাও, আমি চলে যাব।”

বাসুদেব এ-রকম গলার স্বর আগে শোনে নি মণিমালার। গম্ভীর, বিষণ্ণ, উদাস। দুটি চোখ ঘন করে তাকিয়ে আছে মণিমালা।

বিব্রত বোধ করল বাসুদেব। বলল, “আমি তো আপনাকে চলে যেতে বলি নি, দিদি। আমি আপনার অসুবিধের কথা বলেছিলাম। রেলের এই কোয়ার্টারে আপনি কেমন করে থাকবেন। আলো নেই, জল বয়ে আনাতে হয়। থাকা, খাওয়া দুইয়েরই অসুবিধে আপনার। এ-ভাবে আপনি থাকতে পারবেন কেন।”

মণিমালা বলল, “পারব না কেন ?”

বাসুদেব হাসল। "আপনাকে দেখেই বোঝা যায়, এ-সব অভ্যেস আপনার নেই।"

"আমাকে দেখে এত বুঝে ফেলেছ!" মণিমালা আবার পরিহাস করে বলল।

চায়ের কাপ মাটিতে নামিয়ে রাখল মণিমালা। উঠোনটা অনেক পরিষ্কার দেখাচ্ছে। হালকা জ্যোৎস্না। বাতাস কখনও কখনও দমকা হয়ে আসছে, কাল আরও বেশী এলোমেলো ছিল।

বসে থাকতে থাকতে মণিমালা বলল, "আমার কথা পরে হবে। তোমার কথা বলো।"

বাসুদেব যেন মজা পেল। চায়ে চুমুক দিয়ে মজার গলায় বলল, "আমার আবার কথা কী। নাম বাসুদেব মুখুজ্যে, চাকরি রেলের বুকিং ক্লার্ক।"

"ফাজলামি করো না", মণিমালা ধমকের গলা করে বলল, "তোমার বাড়ি কোথায়? মা বাবা—?"

"বাড়ি বর্ধমানে। একেবারে শহরে নয়, মাইল পাঁচেক তফাতে।" বলে বাসুদেব বাকি চা-টুকু শেষ করল। কাপ নামিয়ে রাখল। "বাবা নেই, মা আছে। বাবা মারা গিয়েছেন অনেক দিন, আট দশ বছর হতে চলল। জ্যাঠামশাই আছেন। তিনিই আমাদের সব।"

মণিমালা একদৃষ্টে বাসুদেবকে দেখছিল। সরল, সাধাসিধে মুখ। গোলগাল গড়ন পুরু নাক, মোটা মোটা ঠোঁট, উজ্জ্বল চোখ। মাথার চুল কোঁকড়ানো, কুচকুচে কালো। বাসুদেবের গড়ন ছিপছিপে। গায়ের রং ফরসা।

বাসুদেব খাটিয়া থেকে উঠে পড়ল। "দাঁড়ান একটু নেশা নিয়ে আসি।"

মণিমালা বসেই থাকল।

সিগারেট দেশলাই নিয়ে ফিরে এল বাসুদেব। সিগারেট ধরাল। ধরিয়ে উঠোনে একটু পায়চারি করার মতন হাঁটল। "আমার বাবাও রেলে চাকরি করতেন। আমি বাবার লাইন ধরে ফেলেছি।" বাসুদেব আবার মজার গলায় হাসল।

মণিমালা হাত দিয়ে ইশারা করে বাসুদেবকে বসতে বলল। "তোমার ভাই বোন নেই আর ?"

"নেই। বলছেন কি। ছু-ছুটো বোন, এক ভাই।" বাসুদেব আবার খাটিয়ায় বসল।

"তুমি বড় ?"

"হ্যাঁ। বড় বোনটার গত বছর বিয়ে হয়েছে। ওর বিয়ে নিয়ে অনেক ভুগতে হয়েছে, দিদির বাঁ হাতে আগুনে পোড়ার বড় একটা দাগ ছিল। বোনের বিস্তর সম্বন্ধ হয়েছে। ছেলের পক্ষ থেকে মেয়ে দেখে গেছে আর ক্যানসেল করে দিয়েছে। বছর ছয়েক লড়ে তবে বিয়ে। তাও জ্যাঠামশাই না থাকলে হত না। আমি পারতাম না।"

মণিমালা অন্তরঙ্গভাবে বলল, "যাক, ভাল বিয়েই তো হয়েছে।"

"তা হয়েছে। আমার ভগ্নিপতি কোলিয়ারীতে কাজ করে। সার্ভেয়ার। ছেলেটা ভাল। তবে ওর বাবা ভাল দুইতে পারে। বিয়েতে যতটা পেরেছে দুয়ে নিয়েছে।"

বাসুদেবের কথা বলার ঢঙ্গে মণিমালা হেসে ফেলল।

বাসুদেব বলল, "হাসার কথা নয়, দিদি। আজকাল লোকে বলে না—পণটণ উঠে যাচ্ছে—কোথায় উঠছে। শয়ে হয়ত একটা। নয়ত সেই সোনা দাও, খাট বিছানা দাও, নমস্কারী দাও। নগদ দাও।"

মণিমালা হেসে ফেলে বলল, "ভালই তো, তুমিও নিয়ো।

"আমি ?" বাসুদেব দমকা হেসে উঠল। "আমার বিয়ে। আসছে জন্মে।"

মণিমালা কৌতুক বোধ করল। "এ-জন্মে কী হল ?"

সিগারেটে লম্বা করে টান দিয়ে বাসুদেব ঠাট্টার গলায় বলল, "একে তো রেলের বুকিং ক্লার্ক, ক পয়সা রোজগার, দিদি। তার ওপর দায়িত্ব। ছোট বোনের বিয়ে, বয়েস বেড়ে যাচ্ছে, ভাই স্কুল শেষ করে কলেজে ঢুকবে এবার। তাকেও তো মানুষ করতে হবে। আমার আর বিয়ে করার টাইম কোথায় ?"

মণিমালা আদর করে বাসুদেবের পিঠের কাছে আলগা ঠেলা মারল। হাসতে হাসতে বলল, "তোমার কপালে কানাইয়া আর পটলবাবু ?"

ঘাড় নেড়ে সায় জানাল বাসুদেব। বলল, "আপনি ভাবছেন আমি ঠাট্টা করছি। তা নয়, দিদি। মাথার ওপর জ্যাঠামশাই আছেন বলে এখনও হাসি-ফক্কুড়ি করে দিন কাটাচ্ছি। গায়ে কিছু মাখতে হচ্ছে না তেমন। জ্যাঠামশাই না থাকলেই হাঁড়ির হাল হয়ে যাবে। বয়েস হয়ে গিয়েছে জ্যাঠামশাইয়ের। খুব ভয় হয়।" বাসুদেব নিঃশ্বাস ফেলল।

মণিমালা বলল, "জ্যাঠামশাইকে খুব ভালবাস তুমি। তাই না?"

"বাসব না। জ্যাঠামশাই দেবতার মতন মানুষ। তাঁর কেউ নেই। জ্যাঠাইমা কোন কালে মারা গিয়েছেন। আমার আর মনেও পড়ে না। বেশী বয়েসে বাচ্চা হতে গিয়ে মারা যান। জ্যাঠামশাই অনেক সহ্য করেছেন। জ্যাঠাইমা গেলেন, তারপর বাবা।" বাসুদেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, অন্যমনস্ক হয়ে গেল হঠাৎ।

মণিমালাও চুপ করে থাকল। বাসুদেবকে আরও ভাল লাগছিল।

মায়া হচ্ছিল।

সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাসুদেব বলল, "আমার জ্যাঠামশাই স্কুলের মাস্টার ছিলেন ; হেড মাস্টার। বেশ নাম-ডাক ছিল তাঁর।" বাসুদেব হঠাৎ চুপ করে গেল।

মণিমালার মনে হল, বাসুদেব যেন কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। অপেক্ষা করল মণিমালা। "তুমি কতদিন এই চাকরি করছ?"

"ছ সাত বছর। ঘষড়াচ্ছি তারও আগে থেকে। কতবার যে পরীক্ষা দিয়েছি, দিদি। রেলেই দু তিন বার। শালা ডাকেই না। মুখ থেকে শালা কথাটা বেরিয়ে যাওয়ায় বাসুদেব জিব কাটল। হেসে ফেলল। "শালা কথাটা এমন কিছু খারাপ নয় বলুন?"

মণিমালা হেসে ফেলল জোরে। "না।"

"আমার তো একটা ক্লেম ছিল। বাবা রেলে চাকরি করতেন, হঠাৎ মারা গেলেন। বেটারা ইচ্ছে করলে আগেই একটা চাকরি দিয়ে দিতে পারত। দিল না। বছর দু তিন ভুগিয়ে তবে দিল। কম হায়রানি করেছে। দেখুন না, এই ক'বছরের চাকরিতে বার চারেক ট্রান্সফার। একজন মুরুব্বি ধরতে পারছি না। পারলে ট্রান্সফার থেকে বাঁচতুম।"

"তোমার কত বয়েস হল?"

"তেত্তিরিশ হবে।"

"আমার চেয়ে অনেক ছোট। প্রায় ছ সাত বছর।"

"আপনাকে হাই ফ্যামিলির মহিলা বলে মনে হয়।"

হাসল মণিমালা। "লেখা আছে?"

"বাঃ, চেহারা।"

"চেহারায় সব বোঝা যায়?"

"তা যায় না। কি বলছেন। চেহারা, সাজপোশাক, কথাবার্তা।"

মণিমালা হাত বাড়িয়ে বাসুদেবের দেশলাইটা টেনে নিল। নাড়াচাড়া করল। বলল, "তুমি কি বড় ঘরের ছেলে নও! তুমিও বড় ঘরের ছেলে। তোমার মতন বোধ-সোধ সহবত কজন ছেলের থাকে ভাই।"

বাসুদেব চুপ করে থাকল।

মণিমালাও কিছুক্ষণ কথা বলল না।

শেষে বাসুদেব বলল, "কুষ্ঠাশ্রমের কথাটা আপনি বললেন না?"

মণিমালা বাসুদেবের চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল দু পলক। তারপর বলল "বলব। এত তাড়া কিসের।" বলে মণিমালা খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বাসুদেবের খেয়াল হল রাত হয়ে আসছে পটলবাবুর দোকানে যেতে হবে।

মণিমালা হেঁট হয়ে কাপ প্লেট তুলে নিচ্ছিল।

পাঁচ

চোখে জল পড়তেই বাসুদেব ধড়মড় করে উঠে বসল।

মাথার দিকে মণিমালা দাঁড়িয়ে আছে। হাসি-হাসি মুখ। মণিমালা বলল, "উঠুন মুখুজ্যেমশাই, রোদ এসে গায়ে পড়ছে যে।"

গায়ে রোদ না পড়লেও সূর্য উঠে গিয়েছে, রোদের আভা এসে পড়েছে পাঁচিলে। বাসুদেব বড় বড় হাই তুলে আড়মোড় ভাঙ্গল।

মণিমালার হাতে টুথব্রাশ চোখ মুখ ভিজে, মাথার চুল পিঠে

ছড়ানো। সাদা খোলের শাড়ি, চওড়া পাড়। বাসী মুখ সামান্য ফোলা দেখাচ্ছিল।

খাটিয়া ছেড়ে উঠতে উঠতে বাসুদেব বলল, "দারুণ ঘুমিয়েছি।"

"বেশ করেছেন। এবার উঠে আপনার স্টোভটা জ্বালিয়ে দিন।" বলতে বলতে মণিমালা ঘরে চলে গেল।

বাসুদেব আবার হাই তুলল। আকাশের দিকে তাকাল একবার। পরিষ্কার আকাশ। কাক-চড়ুই ডাকছে। একটা মালগাড়ি যাচ্ছে লাইনে শব্দ উঠছে।

বালিশের তলা থেকে চাবি বার করে বাসুদেব ঘরের দরজা খুলল।

মণিমালা হাত মুখ মুছে এ-ঘরে এসে দেখে বাসুদেব স্টোভ জ্বালাতে ব্যস্ত।

জানলাটা খুলে দিল মণিমালা। আলো এল।

"হল না?" মণিমালা বলল।

"পাম্পটা গোলমাল করছে।" বাসুদেব স্টোভে পাম্প দিতে দিতে বলল, "দাঁড়ান, আজ ওয়াশার পাল্টাব।"

"এখন তো ছাড়ো।'

বাসুদেব উঠে পড়ল। মোটামুটি জোর হয়েছে আগুন।

মণিমালা চা করতে বসল।

সদর খুলে মুখ ধুয়ে বাসুদেব ঘরে এসে দেখে মণিমালা চা ঢালছে।

"কাল আপনার ঘুম হয়েছে?" বাসুদেব মাটিতে বসে পড়ল।

"হয়েছে।"

"গরম লাগে নি?"

"তেমন কিছু নয়।"

বাসুদেব বুঝতে পারল, গরম লাগলেও মণিমালা স্বীকার করবে না।

চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে মণিমালা বলল, "আরও আছে। ওটা শেষ করে নাও।"

বাসুদেব চায়ে চুমুক দিল। "মার্ভেলাস।"

মণিমালা নিজের চা নিয়ে বাসুদেবের দিকে মুখ করে বসল। "কাল রাত্তিরে একটা ইঞ্জিন ঠায় দাঁড়িয়ে যা আওয়াজ করেছে। কত রকম আওয়াজ।"

"ডিজেল বোধ হয়। বিগড়ে গিয়েছিল।"

"আমার মাথা বিগড়ে যাচ্ছিল। তুমি জানতে পার নি?"

"না," বাসুদেব মাথা নেড়ে হাসল। "ঘুমোচ্ছিলাম। আমাদের সব অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। সারা দিন রাত তো গাড়ির শব্দই শুনছি। শব্দ না শুনলেই ঘুম আসবে না।"

মণিমালা ধীরে সুস্থে চা খাচ্ছিল। বাসুদেবকে দেখছিল, কখনও বা জানলার দিকে তাকাচ্ছিল। পূবের দিক। বেশ আলো আসছে। জানলার বাইরে কটা আগাছা, ওরই মধ্যে একটা আকন্দ ফুলের গাছ জানলার গা ছাড়িয়ে উঠেছে।

কাঠের বেয়াড়া বাক্সটার দিকে চোখ পড়ল মণিমালার। "ওটাতে তোমার কি আছে গো?"

বাসুদেব তাকাল। "ওই বাক্সটায়?"

"ধন-রত্ন?" মণিমালা হাসল।

বাসুদেব রগড়ের গলায় বলল, "ওটা আমার পৈতৃক সম্পত্তি।"

কিছুই বুঝল না মণিমালা। কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে থাকল।

বাসুদেব মজা করে করে বলল, "হাঁড়ি কুড়ি, কুকার, হাতাখুন্তি, গোটা কয়েক কৌটো।"

মণিমালা আরও অবাক। "হাঁড়ি কুড়ি?"

"সংসার," বাসুদেব হাসতে হাসতে বলল, "মা সব সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছিল, ছেলে রান্নাবান্না করে খাবে।" চায়ে লম্বা করে চুমুক দিল, "সব জায়গায় তো পটলবাবুর দোকান নেই, বনে বাদাড়েও পড়তে হয় দিদি, তখন হোয়াট টু ইট। নিজেই হাত পুড়িয়ে ভাতে ভাত, ডিমের তরকারি, চালে ডালে করে খেতে হয়। অনেক দিন খেতেও হয়েছে।"

মণিমালা হেসে ফেলল। "ওমা, তুমি আবার রান্নাও করতে পার?"

"পারি বই কি। খিচুড়ি-টিচুড়ি দারুণ পারি।"

মণিমালা হেসে আকুল। বাসুদেবের চা ঢেলে দিল মণিমালা।

বাইরে কানাইয়া এসেছে। তার গলা পাওয়া গেল।

চা শেষ করে মণিমালা উঠল, কাঠের বাক্সটার কাছে গিয়ে বলল, "খোলো তো ডালাটা, দেখি।"

বাসুদেব উঠে এসে ডালা খুলল।

তালা খুলতেই ভেতর থেকে সোঁদা, চাপা গন্ধ বেরুল। তারই সঙ্গে আরশোলা। ইঁদুর-টিদুরও থাকতে পারে। হাঁড়িকুড়ি, কুকারের বাটি গোটা দুয়েক। মরচে ধরা খুন্তি। কৌটো, এমন কি ভাঙা-চোরা কাচের প্লেট। ওই জঞ্জালের মধ্যে আর যে কি আছে বোঝা গেল না।

বাইরে কানাইয়া কি যেন জিজ্ঞেস করছিল। বাসুদেব বাইরে গেল।

মণিমালা জানলার কাছে সরে দাঁড়াল। এ-ঘরের জানলা দিয়ে তাকালে স্টেশনের দিকটা চোখে পড়ে। স্টেশন অবশ্য দেখা যায় না, মালগুদামের মাল খালাসের জায়গাটা চোখে পড়ে। দু একটা দাঁড়ানো মালগাড়ি, কাঠকুটো, বস্তা দেখা যায়।

বাসুদেব আবার ঘরে এসে তার ফেলে-যাওয়া চায়ের কাপটা তুলে নিল।

মণিমালা বলল, "তোমার মা ছেলেকে সবই গুছিয়ে দিয়েছিলেন শুধু একটা জিনিস জুটিয়ে দিতে পারেন নি। একটা বউ জুটিয়ে দিতে পারলেই ষোল কলা পূর্ণ হত।"

বাসুদেব খোলা গলায় হো হো করে হেসে উঠল।

মণিমালা ভুরু কুঁচকে তর্জনের ভান করে বলল, "হাসছ যে।"

বাসুদেব হাসি মুখেই বলল, "বাক্স দিলেই কি বউ দিতে হয়, দিদি। তা যদি দিতে হত তবে মা বেচারীকে সতীন নিয়ে ঘর করতে হত।"

কিছুই বুঝল না মণিমালা। কোন কথার কী জবাব। বলল, "কেন?"

"বললাম না, ওটা আমার পৈতৃক সম্পত্তি," বাসুদেব বলল। "আমার বাবা চাকরির প্রথম দিকে রিলিভিং এ এস এম ছিল। তখন অন্যরকম দিনকাল। বাবাকে আজ এখানে কাল ওখানে করে বেড়াতে হত। কোথায় দু মুঠো খাবে কী খাবে তাই ওই ব্যবস্থা। গন্ধমাদন মার্কা ওই কাঠের বাক্সটায় মা চাল ডাল, তেল আলু, হাঁড়িকুড়ি মায় হরতুকী পর্যন্ত গুছিয়ে দিত বাবাকে। বাক্সর সঙ্গে যদি আবার একটা বউও দিতে হত মাকে বাবার জন্যে তাহলে ভেবে দেখুন মা বেচারীর কী অবস্থা হত।" বাসুদেব আবার হেসে উঠল।

হেসে ফেলেছিল মণিমালা। ধমক দিয়ে বলল, "ফাজলামি তো বেশ শিখেছ।"

বাসুদেব হাসছিল।

বাইরে এল মণিমালা। উঠোনে রোদ নেমেছে। কানাইয়া বালতি করে জল তুলে আনছিল। রান্নাঘরের দরজা খোলা। ডালিম ঝোপের গোড়ায় একজোড়া শালিখ লাফালাফি করছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মণিমালা কিছু ভাবছিল।

বাইরে এল বাসুদেব। সিগারেটের প্যাকেট খুঁজল।

কলঘরে জল ভরতে সময় লাগে কানাইয়ার। কুয়া থেকে জল তুলে তুলে আনতে হয়। মণিমালা আসায় জলও বেশী লাগছে।

আর খানিকটা পরে স্নান করে নেবে মণিমালা। তার স্নানের পর আবার জল ভরে দেবে কানাইয়া। বাসুদেবের স্নান করতে করতে দশ, সাড়ে দশ।

বালতি হাতে কানাইয়া চলে যাচ্ছিল, মণিমালা ডাকল। "এই তুই বাসন মাজতে পারিস?"

কানাইয়া দাঁড়িয়ে থাকল। কথাটা বুঝতে পারল না যেন।

বাসুদেব কানাইয়াকে বলল, বার্তান সাফা তু না পারবি রে?"

"সাফা না করলি উ বাটিয়া কাল।"

বাসুদেব মণিমালার দিকে তাকাল। টিফিন কেরিয়ারের কথা বলছে।

মণিমালা মাথা নাড়ল। "টিফিন কেরিয়ার নয়। তোমার ওই বাক্সর বাসনগুলো মাজতে পারবে না?"

অবাক হয়ে মণিমালার মুখ দেখল বাসুদেব। "ওই বাসনগুলো? ওগুলো মাজবে কেন?"

"মাজলে তোমার আপত্তি আছে ?"

"না না, আপত্তি নয়। অযথা মাজবে কেন।"

"কত দিন ধরে নোংরা হয়ে পড়ে আছে, বাক্সর মধ্যে যত আরশোলা আর নেংটি ইঁদুরের ময়লা। পরিষ্কার করলে তোমার পৈতৃক সম্পত্তির ক্ষতি হবে না।"

বাসুদেব ছেলেমানুষের মতন হাততালি দিয়ে হেসে উঠল।

বিরক্তির ভান করে মণিমালা বলল, "তুমি আর হ্যা-হ্যা করে হেসো না তো। বাড়িতে থাকলে ঘুমোও, আর অফিসে থাকলে টিকিট বেচো। আর কি করো বলো তো ?"

"কেন! তাস খেলি; রেডিয়ো বাজাই। গান গাই।" বাসুদেব মজা করছিল।

"থামো। যত অকর্ম!"

"কিন্তু ও বাসন মাজা। কানাইয়ার কর্ম নয়," বাসুদেব বলল।

"কার কর্ম ?"

ঘাড় চুলকে ফাজলামির গলায় বাসুদেব বলল, "আমি পারি।"

কটাক্ষ করে মণিমালা জবাব দিল, "তুমিই বসে যাও তবে।" বলে কানাইয়ার দিকে তাকাল। "বাসন-মাজা লোক নিয়ে আয়, যা। পয়সা দেব।" বলে বারান্দায় আর দাঁড়াল না মণিমালা, তার ঘরে চলে গেল।

বাসুদেবের মজা লাগছিল। কৌতূহলও হচ্ছিল। বাসুদেব কানাইয়াকে বলল, "আরে, পুখন কা মাইয়াকো বোলা দে, তু না সাখবি।"

কানাইয়া বালতি হাতে চলে গেল।

বাজার থেকে ঘুরে এসে বাসুদেব বলল, "দিদি, আজ একটা

স্পেশ্যাল জিনিস আনলাম। টাটকা বালুসাই। খেয়ে দেখুন।"

স্নানের আয়োজন করছিল মণিমালা। চুলের জট ছাড়িয়ে নিচ্ছে। টিনের চেয়ারের ওপর শাড়ি জামা তোয়ালে গুছিয়ে রেখেছে।

"তুমি খাও। আমি চানটা সেরে আসি।"

"দুটো বালুসাই মুখে দিয়ে চান করতে যান দারুণ লাগবে।"

"দূর, আমি এখন চান করতে যাচ্ছি।"

"তা হলে থাক, আপনি আসুন—তারপর খাওয়া যাবে।"

"খাও না তুমি।"

"এক 'যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে। আসুন আপনি। আমি ততক্ষণ স্টোভটা নিয়ে আসি। ওয়াশার পালটে ফেলি।"

মণিমালা চেয়ার থেকে কাপড়-জামা তুলে নিল। সাবান নিল নতুন। কাল আনিয়েছে কানাইয়াকে দিয়ে।

চলে গেল মণিমালা।

বাসুদেব দাঁড়িয়ে থাকল। চেনা, অভ্যস্ত, অন্তরঙ্গ এই ঘর কেমন যেন আলাদা আলাদা লাগছে না আলাদা নয়, একটু নতুন নতুন।

বাসুদেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। তক্তপোশের তলায় মণিমালার বড় সুটকেস। টুলের একপাশে—যেখানে বাসুদেবের দাঁতের মাজন, দাড়ি কামাবার জিনিসপত্র থাকত, সেখানে তার জিনিসের পাশাপাশি মণিমালার দাঁতের ব্রাশ পেস্ট পড়ে আছে। নতুন সব। সাবানও আনিয়েছে মণিমালা। ভাল সাবান। টেবিলে মণিমালার পাউডার। আয়নাটাও টেবিলে রেখেছে। ঘরের একপাশে বাড়তি একপ্রস্থ শাড়ি জামা। শাড়িটার রং খুব হাল্কা, জমিতে ছাপ কচি সবুজ রংয়ের জামা।

এক রাশ লটবহর, জামা-কাপড়, স্নো সাবান তেল সিঁদুর নয়,

সামান্য কটা মেয়েলী জিনিস, অথচ ঘরটা যেমন ছিল তেমন আর নেই। বাসুদেবের মজা লাগছিল, দেখতেও ভাল লাগছিল। কিছুদিন আগেও এই রকম হয়েছিল তার নিয়োগীদার বাড়িতে গিয়ে। নিয়োগীদার স্ত্রী বাপের বাড়ি থেকে সদ্য ফিরেছে কোলে বাচ্চা নিয়ে। বাসুদেব নিয়োগীদার ঘরে ঢুকতেই দেখে, খাটের ওপর বাচ্চার কাঁথা বালিশ বিছানো, পাশে একটা খাঁচার রঙীন মশারি পড়ে আছে। একপাশে কাজললতা। বাচ্চা তখন ঘরে নেই, বউদির কাছে। ভেতরে। কিন্তু ওই কাঁথা, কাজললতা, মশারি দেখেই বাসুদেবের মনে হল, নিয়োগীদার বিছানার চেহারাই কেমন অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। বেশ লাগছিল তার। হাসিও পাচ্ছিল। আসলে, সামান্য একটু হের-ফেরে কেমন যেন হয়ে যায়। বাসুদেব স্নিগ্ধ নরম চোখ করে ঘরটা দেখল ; মনে মনেই নিজের সঙ্গে একটু রসিকতাও না করে পারল না। ধরো যদি বিয়ে করে বউ নিয়ে এই কোয়ার্টারে সংসার পাতে বাসুদেব—তাহলে ঘরটার কতই না চেহারা পালটে যাবে। তার বউয়ের নতুন তোরঙ্গ থাকবে একপাশে, তার ওপর বিয়েতে পাওয়া বাসুদেবের নতুন স্যুটকেস। তার বউ একটা সাদামাটা অথচ বাহারী কিছু দিয়ে ঢাকা দেবে নতুন তোরঙ্গ স্যুটকেস। বিছানার ওপর গুছিয়ে কিছু পাতা থাকবে, পাশাপাশি বালিশ। আলনায় বউয়ের ডুরে শাড়ি পেটিকোট টেটিকোট ঝুলবে। মাথার তেল আলতা সিঁদুর স্নো পাউডার চুলের কাঁটা কত কি থাকবে তখন টেবিলে। দারুণ লাগবে তখন, তাই নয় ?

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেলল বাসুদেব। তারপর পাশের ঘরে চলে গেল স্টোভ সারাই করতে।

স্টোভটা প্রায় সেরে ফেলেছে বাসুদেব, মণিমালা ঘরে এল।

স্নানের পর স্নিগ্ধ ভেজা ভেজা চেহারা, ঘরোয়া করে পরা শাড়ি, পিঠের ওপর ছড়ানো চুল। চোখমুখ পরিষ্কার।

ঘরে এসে মণিমালা বলল, "দেখো বাইরে কে এসেছে।"

"কে?"

"তুমি নাকি ডেকে পাঠিয়েছিলে?"

বাসুদেব হাঁক দিল, "কৌন রে?"

"পুখন কি মাইয়া, সাব।"

"ঠাহার যা।" বাসুদেব মণিমালার দিকে তাকাল। "পুখনের মা। মাজা ঘষার কাজ করে। কি আপনি হাঁড়িকুড়ি মাজাবেন বলছিলেন।"

"ও। তা যাও না, ওকে সব মাজতে দিয়ে দাও।"

"দেখি, কথা বলি। কিন্তু ওগুলো মাজিয়ে কী হবে অকারণ।"

"তোমার সব অদ্ভুত কাণ্ড। লোক পুরোনো জিনিসপত্র মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করে, পরিষ্কার করায়। তুমি এতো গেঁতো, বাক্স বন্ধ করে রেখেছ তো রেখেইছো। অর্ধেক জিনিসে মরচে পড়ে গেছে, ছ্যাতা ধরছে। যাও তোমার ওই পৈতৃক সম্পত্তি বাইরে বার করো তো। যত ইঁদুরে আরশোলার উৎপাত।"

এক টুকরো কালিঝুলি মাখা কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে বাসুদেব উঠল।

ফিরে এল একটু পরেই বলল, "ও আধ ঘণ্টা পরে আসবে।"

"তাই আসুক।"

বাসুদেব আবার মাটিতে স্টোভের কাছে বসে পড়ল। হাতের ন্যাকড়াটা দিয়ে স্টোভটা পরিষ্কার করতে করতে বলল, "বালুসাইটা কি পড়েই থাকবে?"

"হাত ধোও।"

"ধুচ্ছি। তেলটা ভরে নি।"

"ও-ঘরে এসো তা হলে।"

মেঝেতে দু একটা খুচরো যন্ত্রপাতি, মুখ ভাঙা ভোঁতা কাঁচি, সরু তার, আরও কি কি পড়ে ছিল। কেরোসিন তেলের বোতলও। ঘরে কেরোসিনের গন্ধ উঠছিল।

স্টোভের কাজ সেরে হাত ধুতে চলে গেল বাসুদেব।

টিনের চেয়ারে বাসুদেব, বিছানায় মণিমালা।

বাসুদেব বলল, "আপনার মতলবটা কি, দিদি? সত্যি করে বলুন তো?"

"মতলব! কিসের মতলব?"

"হাঁড়িকুড়ি মাজাচ্ছেন?"

"তোমায় রান্না করে খাওয়াব।" মণিমালা হাসল।

"রান্না। আপনি রান্না করতে বসবেন।" বাসুদেব পুরোপুরি অবাক হল না। তার সন্দেহ হয়েছিল আগেই। "মাথাটাথা খারাপ আপনার।"

মণিমালা ভ্রূ ভঙ্গি করে বলল, "কেন, মাথা খারাপের কী দেখলে?"

"আপনি কি রান্না করবেন! রান্নার হাঙ্গামা কম? তাছাড়া কোথায় চাল, কোথায় ডাল, তেল মশলা উনুন। হাঁড়িকুড়ি থাকলেই রান্না হয়।"

মণিমালা যেন উপেক্ষাই করল কথাটা। বলল, "বাজারে চাল ডাল পাওয়া যায় না বুঝি?"

বাসুদেব মাথা নাড়ল। "না না, ও-সব হাঙ্গামা আপনি করবেন না।"

“তোমার পটলবাবুর হোটেলে যা রান্না করে আমি তার চেয়ে খারাপ করব না।”

“ঠিকই। কিন্তু দু-একদিনের জন্যে কেন এ-সব হাঙ্গামা করবেন। পটলবাবুর দোকানের খাবার আপনি খেতে পারছেন না, জানি। তবু অনর্থক ঝঞ্ঝাট করে কি লাভ?”

মণিমালা বলল, “অনর্থক কেন। আমার শখও তো হতে পারে। বসেই তো আছি সারাদিন, না হয় একটু উনুন নিয়ে বসলাম।”

“আমার বাড়িতে উনুন নেই।”

“স্টোভ রয়েছে।”

“পাগল।” বাসুদেব প্রবল আপত্তি করল। “স্টোভে রান্না করতে গিয়ে আপনি পুড়ে মরুন। ওতে আমি নেই। পুলিশের পাল্লায় ফেলতে চান আমাকে।”

মণিমালা হেসে ফেলল। “পোড়ার হলে সব তাতেই পোড়ে স্টোভে, উনুনে, তোমার ওই লণ্ঠনেও।” বলে একটু হেসে আবার বলল, “আগুন ছাড়াও পোড়ে।”

বাসুদেব কানেই তুলল না কথা। দু হাত জোড় করে বলল, “আমায় মাপ করুন, দিদি। স্টোভ আমি ছুঁতে দিচ্ছি না আপনাকে। আমি একটা স্টোভ অ্যাকসিডেণ্ট দেখেছি। সে-দৃশ্য দেখা যায় না।”

মণিমালাকে বাধ্য হয়েই থামতে হল।

সামান্য চুপচাপ। বেলা বাড়ছে। তাতও বাড়ছিল। খোলা জানলা দিয়ে জ্বলজ্বলে রোদ চোখে পড়ছে। নুড়ি পাথর গেরুয়া মাটি দিয়ে বাঁধানো রাস্তাটা চিকচিক করছে। দু-পাশে রোদ-পোড়া ঘাস।

বাসুদেব বসে থাকতে থাকতে সিগারেট ধরাল। মণিমালাকে দেখল বার কয়েক। তারপর ইতস্তত করে বলল, "একটা কথা বলব, দিদি?"

তাকাল মণিমালা। "বলো।"

"আপনি কিন্তু কিছু মনে করবেন না," সঙ্কোচের গলায় বাসুদেব বলল, "...আপনি আমার এখানে এসে রয়েছেন। আমাদের রেল স্টাফের অনেকেই জিজ্ঞেস করছিল।...আমি বলছি, আপনি সম্পর্কে আমার দিদি হন। কলকাতা থেকে এসেছেন। কুষ্ঠাশ্রমে আপনার কাজ আছে। দু চার দিন পরে চলে যাবেন।"

মণিমালা শুনল, জবাব দিল না।

"আপনি কিছু মনে করলেন, দিদি?"

"না। তুমি তো ঠিকই বলেছ।"

"রেল স্টাফের ব্যাপার তো। চাকরি করে, কোয়াটারে থাকে দ্বন্দ্ব ইয়ে—মানে মশকরার গল্প করে দিন কাটায়। তবু এখানে মাত্র ছ সাতটা কোয়ার্টার। বড় বড় রেল কলোনি যে কী জিনিস আপনি জানেন না।" বাসুদেব একটু থেমে বার কয়েক টান দিল সিগারেটে। "নিয়োগীদার বাড়ি থেকে বউদি একদিন দেখা করতে আসবে আপনার সঙ্গে। বউদি খুব ভাল। তবে আমাদের মাস্টারমশাইয়ের গিন্নী তেমন সুবিধের মানুষ নয়। দজ্জাল গোছের। শুনেছি গিন্নীও নাকি আসবে আপনাকে দেখতে।"

"আমি কি দেখার জিনিস হয়ে উঠলাম?"

"এক রকম তাই।...একটা ব্যাচেলার ছোকরা একপাশে পড়ে থাকে তার বাড়িতে হুট করে এক মহিলা এসে হাজির। কিউরিয়োসিটি যাবে কোথায়?...নিয়োগীদার বউ কিন্তু এমনই দেখা করতে

আসবে।”

মণিমালা বলল, “যার খুশি আসুক, তোমার কোনো ভাবনা নেই।”

বাসুদেব এক মুখ ধোঁয়া টানল। “আমার আবার কিসের ভাবনা। আপনারই খারাপ লাগতে পারে।”

কেমন অন্যমনস্ক হয়ে সামান্য বসে থাকল মণিমালা। পরে বলল, “এক একজন মানুষ থাকে যাদের কপালে খারাপ লাগাটা সহ্য হয়ে যায়। আমার হয়েছে তাই।”

বাসুদেব কি মনে করে আচমকা বলল, “কুষ্ঠাশ্রমের কথাটা তো আপনি বলছেন না, দিদি। কার খোঁজের কথা বলছিলেন?”

মণিমালা চোখে চোখে তাকাল বাসুদেবের। কয়েক পলক। মুখ গম্ভীর হল। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, “অমলেশ বলে একজনের খোঁজ দরকার।”

“অমলেশ—” বাসুদেব কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকল। “কুষ্ঠাশ্রমে আছেন?”

“শুনেছি।”

“রোগী?”

“হতে পারে। সঠিক জানি না।…শুনেছি সে ওখানে আছে।”

“রোগী না হলে থাকবে কেন। আর যদি ডাক্তার হয়।”

“ডাক্তার সে নয়।”

বাসুদেব রহস্যটা বুঝতে পারছিল না। “আপনার কেউ হয়, দিদি?”

তাকাল মণিমালা। দৃষ্টি কেমন উদাস। “না, হ্যাঁ—কেউ না হলে আর খোঁজ করতে আসব কেন?”

বাসুদেব ভাবছিল। বলল, "খোঁজ করব?"

"আমি নিজেই যাব।"

"তার আগে খোঁজটা করলে হয় না। এখান থেকে বাসে করে আপনি যেতে পারবেন। কিন্তু এ-বেলা গেলে ও-বেলার আগে আর ফেরার উপায় নেই। কষ্ট হবে আপনার। তাছাড়া কুষ্ঠদের জায়গায় গিয়ে সারাদিন থাকবেন কোথায়।...আমি আগে খোঁজ নিই।"

মণিমালা কোনো জাবাব দিল না।

ছয়

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে বাসুদেব বলল, "কাল বিকেলে আপনার অমলেশের খবর পাওয়া যাবে। হরিদয়ালবাবুকে বলেছি। তিনি ওদিক দিয়ে আসা-যাওয়া করেন। বললেন খোঁজ নেবেন।"

মণিমালা আগের দিনের মতনই উঠোনে খাটিয়া পেতে বসে বসে বাসুদেবের অপেক্ষা করছিল। আজ চাঁদের আলো আরও পরিষ্কার। মণিমালার পরনেও সাদা খোলের শাড়ি; গায়ের জামাটাও সাদা।

"আজ বিকেলে তোমার মাস্টারমশাইয়ের গিন্নী এসেছিল।" মণিমালা হেসে বলল।

বাসুদেব আঁতকে ওঠার ভাব করল। "এসেছিল? কী বলল?"

"গল্প-টল্প করে গেল।" মণিমালা এমন সুর করে বলল যেন মাস্টার গিন্নীর সঙ্গে তার ভালই ভাব-সাব হয়ে গিয়েছে।

বাসুদেব বিশ্বাস করল না। "কী বলল বলুন না?"

মণিমালা ঠাট্টা করে বলল, "বলার কথা তো একটাই। তার

কোন বোনঝি আছে, পরীর মতন দেখতে, লেখাপড়া শিখেছে, তার সেই বোনঝির সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করে দিতে হবে।"

বাসুদেব গায়ের জামা খুলতে খুলতে বলল, "ডানাকাটা পরীর জন্যে আমার মতন টিকিসবাবু।...ঠাট্টা রাখুন, কেমন লাগল বলুন মাস্টার-গিন্নীকে?"

"খুব হুঁশিয়ার। বাজিয়ে দেখতে এসেছিল। কথাবার্তা শুনলে গা জ্বলে যায়। তবে সুবিধে করতে পারল না। আমি তোমার মুণ্ডু চিবিয়ে এমন করলাম, মাস্টার-গিন্নী জল হয়ে গেল।"

"আমার মুণ্ডু চিবোলেন মানে?" বাসুদেব অবাক হয়ে বলল।

"গালমন্দ করলাম তোমার নামে। অপদার্থ, আড্ডাবাজ, খুঁটি ছাড়া গরু যেমন চরে বেড়ায় সেই রকম চরে বেড়াচ্ছ। নিজের শরীর স্বাস্থ্য খাওয়া-দাওয়া কোনো দিকেই হুঁশ নেই। মাসে দু-একটা চিঠি লেখা ছাড়া বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।"

বাসুদেব হাঁ হয়ে গেল। "এই সব বললেন আপনি?"

"বললাম। ফেনিয়ে ফেনিয়ে বললাম, তারপর ওর কাছে একটা বঁটি ধার চাইলাম।"

"বঁটি?"

"কালই পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন?"

বাসুদেব ঘাবড়ে গেল। "বঁটি আপনি কি করবেন?"

"তোমার গলা কাটব। নাও, আর গড়িমসি করতে হবে না, বলেছিলাম একটু তাড়াতাড়ি আসতে—এই তোমার তাড়াতাড়ি। যাও, গায়ে জল ঢালো, চা খাও। চা খেয়ে আমায় নিয়ে একবার বাজারে চলো।"

"বাজার? এখন বাজারে গিয়ে কি করবেন?"

“কেন, আমায় কি বাজার যেতে নেই। দু দিন ধরে বাড়িতেই একঠায়ে বসে আছি। একটু বেড়িয়ে আসব। তোমাদের এখানে দোকান-পশার খোলা থাকবে তো?”

“তা থাকবে দু চারটে। কটাই বা দোকান। কিন্তু সত্যি সত্যি বলুন না, মাস্টার-গিন্নী কোনো ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে গেল কিনা? টাইপটা ভাল নয়।”

মণিমালা বলল, “তুমি ভাবছ, সন্দেহ করল কি না! তা আর করতে দিই নি। বলেছি, কুষ্ঠ হাসপাতালে আমার দেওর রয়েছে, এখানে এসে উঠেছি দেওরকে দেখতে যাব বলে।”

বাসুদেব পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হল না। মণিমালা কি বুঝবে না, মাস্টার-গিন্নীর মুখ থেকে কোনো গুজব ছড়িয়ে গেলে বাসুদেবেরই মুশকিল। ব্যাপারটা নিয়ে কানাকানি হবে, দুর্নাম রটবে, লজ্জায় পড়ে যাবে বাসুদেব।

মাস্টার-গিন্নীকে মণিমালা যদি সামলাতে পেরে থাকে, ভাল কথা।

দরজায় তালা দিয়ে বাসুদেব বলল, “এখানের বাজার দেখার মতন নয়। খুবই ছোট। মেরে কেটে পঁচিশ তিরিশটা দোকান। সকালের দিকে রাস্তায় আলু পটল ঝিঙ্গে শাকসব্জির দোকান বসে। মাছটাছও অল্পস্বল্প পাওয়া যায়।”

মণিমালা পা বাড়াল। সামনেই মাঠ। তফাতে কুলি কোয়ার্টারস।

বাসুদেব এগিয়ে এসে বাঁ দিকটা দেখাল “এ-দিকটায় স্টেশন, দেখতেই পাচ্ছেন। উঁচু মতন জায়গাটা গুডস শেড। মাল খালাস

হয়। আপনার এই লাইনটাই বরাবর চলে গিয়েছে, গয়াটয়া পড়বে, ও-পাশে—মানে লাইন টপকে গেলে ছু পাঁচটা বাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। সিকি মাইলটাক তফাতে গাঁ-গ্রাম দেহাতীদের। আর এদিকটায় বাস স্ট্যাণ্ড, বাজার, থানা, পোস্টঅফিস।”

মণিমালা হাঁটছিল। মাঠের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। একটা কুল ঝোপ দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই ইটের ছোট পাঁচিল। একটা লম্বা বাঁশ পোতা। বাঁশের মাথায় পতাকা ধরনের কি যেন উড়ছে। এক জোড়া কুকুর গায়ে গায়ে ছুটে গেল মাঠ দিয়ে।

খানিকটা এগিয়ে এল দুজনে।

বাঁ দিকে স্টেশনের অনেকটা চোখে পড়ে; আলো জ্বলছে প্লাটফর্মে। স্টেশনের মুখোমুখি, এ-পাশে বাবু কোয়ার্টারস। বাবু কোয়ার্টারের গা দিয়ে নুড়ি ছড়ানো রাস্তাটা সামান্য বাঁক খেয়ে চলে এসেছে। একটা জলের ট্যাঙ্ক লাইন বরাবর। তারই হাত কয়েক তফাত থেকে টিলার মতন উঁচু জমি শুরু হয়েছে, আড়াল পড়ে গিয়েছে রেল লাইন।

বাবু কোয়ার্টাসে বাতি দেখা যাচ্ছিল। বাসুদেব কোয়ার্টাসের রাস্তা ধরল না। মাঠ ভেঙ্গে কোণাকুণি হাঁটতে লাগল। এই রাস্তা টাই সুবিধের, তাড়াতাড়ি হবে।

মণিমালা বলল, “তোমার কপালে ও-রকম কোয়ার্টার জুটল না কেন?”

“কোয়ার্টার কম। মাত্র ছটা কোয়ার্টার ওখানে। আমি নতুন এসেছি, একা মানুষ।”

“ওদের তো আলো জল আছে?”

“আগে ছিল না। এখন হয়েছে। জলের পাইপ বসেছে সেদিন।”

"তোমার কোয়ার্টারটা একটেরে।"

মাথা হেলায় বাসুদেব। "ওটা ঠিক আমার কোয়ার্টার নয়। কথা ছিল ওখানে তিন চারটে কোয়ার্টার হবে। হতে হতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রেলের কারবার। ওই জন্যেই তো আমার কোয়ার্টারে আলো জল কিছুই নেই। এমনিতেও দেখেন নি, কত অব্যবস্থা।"

মণিমালা আর কিছু বলল না। কাছাকাছি নালা। গন্ধ এল। একটা কাঁঠাল গাছ সামনেই। চাঁদের আলো পড়েছে গাছের পাতায়। নীচেটা অন্ধকার।

বাসুদেব নিজেই বলল, "আমি প্রথমে এসে পটলবাবুর দোকানের একটা কুঠরিতে ছিলাম। তারপর মাস্টারমশাইকে ধরাধরি করে ওই কোয়ার্টার।"

হাঁটতে হাঁটতে বাবু কোয়ার্টারের পেছনের দিকে চলে এসেছিল বাসুদেবরা আর খানিকটা এগুলেই বাজার, বাস স্ট্যাণ্ড।

বাজারের কাছাকাছি মোরমের চওড়া রাস্তা স্টেশনের দিকে চলে গেছে। জায়গাটা কেমন ত্রিভুজের মতন। ডান দিকে পাথর নুড়ি দিয়ে বাঁধানো পথ। চার পাঁচটা ছোট বড় গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে, আড়াল পড়ে গেছে বাজারটা।

বাসুদেব ডান দিকের পথ ধরল।

গাছ ক'টা পেরিয়ে আসতেই বাজার।

সদর রাস্তার দু পাশে পোড়ো জমি। ওরই আশেপাশে ছিটোনো ছড়ানো দোকান। পেট্রম্যাকস বাতি জ্বলছে কোথাও, কোথাও লণ্ঠন ঝুলছে। বিস্তর গাছপালা, দুদিকেই ঝোপঝাড়।

বাসুদেব মাঠকোটা ধরনের একটা বাড়ি দেখাল। বলল,

"পটলবাবুর দোকান।"

মণিমালা দূর থেকে বাড়িটা দেখল। নীচে পেট্রম্যাক্স বাতি জ্বলছে, মিষ্টির দোকানের মতনই দেখায়। দু তিনটে বেঞ্চি বাইরে বার করা, দোকানের কাছাকাছি অল্প কজন খদ্দের। বেঞ্চিতে বসে গল্পগুজব করছে না খাচ্ছে বোঝা যায় না।

"বাড়িটা দোতলা নাকি?" মণিমালা জিজ্ঞেস করল।

"দোতলা মানে—ওপরে কুঠরি আছে। একটায় পটলবাবুর দোকানের মালপত্র থাকে, অন্যটায় তিনি থাকেন। মাথার ওপর খোলার চাল। ও যা বাড়ি, যে কোনদিন ভেঙ্গে পড়বে।"

মণিমালা পরিহাস করে বলল, "ভাগ্যিস তোমার মাথায় ভেঙ্গে পড়ে নি।"

বাসুদেব হাসল।

বাজারের রাস্তায় পড়ে বাসুদেব ডান দিকে একটা ছোটখাট টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ি দেখাল। বলল, 'বাস অফিস। এখানেই বাস দাঁড়ায়।"

মণিমালা কৌতূহলের চোখ নিয়ে সব দেখছিল। ছাড়া ছাড়া বেখাপ্পা বাড়ি। দোকান বলেই মনে হয়। বেশীর ভাগই যেন কোনো রকমে দাঁড় করানো, কোনো ছিরি ছাঁদ নেই।

একটা পানের দোকানের সামনে রেডিয়ো বাজছে। হিন্দী গান হচ্ছিল। জোরে জোরেই। সাইকেল নিয়ে মোটা মতন একটা লোক পান খাচ্ছে, তার পাশে ওরই কোনো ইয়ার দোস্ত। লোকটা মণি-মালাদের দেখছিল, হাঁ করেই।

মণিমালা বলল, "মুদির দোকান কই গো?"

"মুদির দোকান?"

"বন্ধ নাকি ?"

"বাসুদেব বেশ অবাক হয়ে বলল, "মুদির দোকানে আপনি কি করবেন ?"

"কি করব দেখতেই পাবে। দোকান কই ?"

"চাঁছুর দোকানে চলুন তা হলে। কিন্তু মুদির দোকানে আপনার কী দরকার ?"

"চলো না, দেখবে।"

চাঁছুর দোকান সামান্য এগিয়ে।

রাস্তা ধরে হাঁটছিল দু জনে। দু পাশের বড় বড় গাছপালার দরুন চাঁদের আলো আড়াল পড়ে আছে। ঝাপসা অন্ধকারও লাগছিল। হঠাৎ কোথাও কোথাও, গাছপালা না থাকায়, রাস্তার ওপর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে গেছে। কাঁচা রাস্তায় চাঁদের আলোয় ধুলোর রং ধরেছে।

বাঁদিকে একটা মন্দির মতন, তার পাশেই কাঠের জাফরি দেওয়া পাকাপোক্ত ছোট বাড়ি। ওটা নাকি পোস্ট অফিস। ডান দিকে কয়লার দোকান, স্তূপ করে কয়লা পড়ে আছে, তার হাত কয়েক দূরে একটা মনিহারী দোকান, নিবু-নিবু হ্যাজাক ঝুলিয়ে রেখেছে সামনে।

হাঁটতে হাঁটতে মণিমালা সাধারণ কথাবার্তা জিজ্ঞেস করছিল। এটা কি ? ওটা কি ? তোমাদের এখানে বাঙালী কত ? অনেক গাছপালা এখানে, তাই না ?

শেষে চাঁছুর দোকান।

একতলা বাড়ি। ভেতরের দিকে চাঁছুদের বাড়ির লোকজন থাকে, বাইরের দিকটায় দোকান। একপাশে তার মুদিখানা, অন্যপাশে স্টেশনারী।

দোকানে খদ্দের নেই। চাঁতু আর চাঁতুর দোকানের লোক কিসের হিসেবপত্র করছিল; বাসুদেবকে দেখতে পেয়ে খাতির করে ডাকল। দেখছিল মণিমালাকে।

চাঁতু মাড়োয়ারী। বাঙালী খদ্দেরের সঙ্গে বাংলা কথা বলে হিন্দী মেশানো।

"বোলিয়ে মুখার্জিবাবু। বসুন মায়জী। কুরসিতে বসুন।"

মণিমালা ইতস্তত করে কাঠের চেয়ারে বসল। বাসুদেব টিনের চেয়ারে। বসে সিগারেট ধরাল।

দোকানটা দেখছিল মণিমালা, তারপর চাঁতুকেই বলল, "ভাল চাল আছে তো?"

বাসুদেব তাকাল মণিমালার দিকে। বেশ অবাক হল।

চাঁতু বলল, "হ্যাঁ, হ্যায়। মাগর আভি তো ইধার নেহি হ্যায়। কাল নিয়ে নিন। দোকানে যো চাউল আছে উ আচ্ছা নেহি। ভিতর সে বাহার করতে হবে।"

"সকালে পাব?"

"জরুর।"

"ডাল, তেল, চিনি, মশলাপাতি। গুঁড়ো মশলা আছে?"

"সব মিল যায়গা।"

"তা হলে—" মণিমালা বাসুদেবের দিকে তাকাল। "নিয়ে যাব কেমন করে?"

বাসুদেব গম্ভীর, নীচু গলায় বলল, "আমি কি জানি।"

মুখ টিপে মণিমালা এমন করে হাসল যেন চাঁতুর নজরে না পড়ে।

চাঁতু নিজেই বলল, "আভি রাতমে তো লিয়ে যাবার সুবিস্তা হবে না, মায়জী। আপ লিখে দিয়ে যান—কাল ফজিরে আমি ভেজ দেব।"

মণিমালার পছন্দ হল ব্যবস্থাটা। কাল সকালে দোকান থেকেই যখন পাঠিয়ে দেবে তখন আর কথা কি। মাথা নাড়ল মণিমালা, সেই ভাল।

চাঁতু একটা কাগজ পেনসিল টেনে নিল। "বোলিয়ে।"

মণিমালা মুখে মুখে ফর্দ বলে গেল। কাগজে লিখে নিল চাঁতু। বিরাট ফর্দ নয়।

সঙ্গে ব্যাগ আনে নি মণিমালা, কিন্তু লুকিযে হাতের মুঠোয় রুমালে টাকা এনেছিল। একশো টাকার নোটটা বাড়িয়ে দিল চাঁতুর দিকে। "টাকাটা নিয়ে নিন।"

চাঁতু কেমন দোনা-মোনা হয়ে গেল। টাকাটা নেবে কি নেবে না। বাসুদেবকে দেখল। তারপর হাত বাড়ল।

বাসুদেব কোনো কথা বলল না। টাকা পয়সা ফেরত নিয়ে মণিমালা উঠে দাঁড়াল।

বাসুদেবও উঠে পড়েছে।

চাঁতু এগিয়ে দিতে দোকানের বাইরে এসে বাসুদেবকে বলল, "ঘরসে কোই আয়া, মুখার্জিবাবু?"

"হ্যাঁ। দিদি।"

"আভি রাহেগি?"

"দো চার দিন।"

দোকান ছেড়ে এগিয়ে এসে বাসুদেব গম্ভীর গলায় বলল, "আপনি খুব অন্যায় কাজ করলেন।"

মণিমালা জানত, বাসুদেব চটে উঠবে। নিরীহ গলায় বলল, "কেন? অন্যায় কি করলাম?"

বিরক্তির চোখে মণিমালাকে দেখছিল বাসুদেব। "আপনাকে

আমি বার বার বারণ করলাম, রান্নাবান্নার হাঙ্গামা আপনি কোয়ার্টারে করবেন না। তবু—”

মণিমালা গুরুত্ব দিল না কথাটার। বলল, “কেন, রান্না করলে দোষ কী?”

“দোষের কথা হচ্ছে না।”

“তবে কিসের কথা হচ্ছে।”

মুখে কথা এল না বাসুদেবের।

খানিকটা রাস্তা একেবারে চুপচাপ। পাশাপাশি হাঁটছে দুজনে। একটা সাইকেল চলে গেল পাশ কাটিয়ে। পায়ের তলায় জাফরিকাটা জ্যোৎস্না। শুকনো খড়ের গন্ধ এল কোথা থেকে কে জানে।

মণিমালা এমনভাবে হাঁটছিল যেন বাসুদেবকে বোকা করে দিয়ে সে যথেষ্ট মজা পেয়েছে।

আড়চোখে দু একবার দেখল। বাসুদেব গম্ভীর।

শেষে বাসুদেব বলল, “দু চারদিনের জন্যে এই শখের কি দরকার ছিল?”

মণিমালা ঘাড় ঘুরিয়ে বাসুদেবকে দেখল। ঠাট্টার গলায় বলল, “শখ কি বরাবরের জন্যে হয়।”

এ-কথার কোনো জবাব হয় না। বাসুদেব চুপ করে থাকল।

কয়েক পা এগিয়ে মণিমালা নিজেই বলল, “তুমি এত রাগ করছ কেন? বাড়িতে দেখলাম বাসনপত্তর কিছু রয়েছে, ভাবলাম তোমায় দু দিন পটলবাবুর হাত থেকে রেহাই দি। মন্দ আর কি করলাম বলো। সারাদিন তো বসেই থাকি।”

বাসুদেব বলল, “আপনাকে বাজারে না আনলেই হত।”

হেসে ফেলল মণিমালা। “না আনলে আমার পা ছিল, কানাইয়া

ছিল, তাকে দিয়ে আনিয়ে নিতাম।”

কথাটা মিথ্যে কিছু নয়। মণিমালা কানাইয়াকে দিয়েও মুদির দোকানের জিনিস আনিয়ে নিতে পারত।

মণিমালার কাছে বাসুদেব যেন জব্দ হয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ ছেলে-মানুষের মতন জেদী গলায় বলল, “স্টোভে কিন্তু আপনি রান্নাবান্না করতে পারবেন না।···আমার ভীষণ ভয়। নিজের চোখে যা দেখেছি একবার—।”

জব্দ করা গেল না মণিমালাকে। ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, “উনুনের ব্যবস্থা আমি করেছি।”

বাসুদেব আবার অবাক হল। “সেটাও কি কানাইয়াকে দিয়ে?”

“হ্যাঁ, কানাইয়াকে দিয়ে। ছোট লোহার উনুন।” হাসছিল মণিমালা।

পুরোপুরি হেরে গিয়ে বাসুদেব বলল, “তাহলে আর বাকি রইল কি। শিলনোড়াটাই বোধহয় যোগাড় হয় নি। ওটাও কানাইয়াকে দিয়ে করে নেবেন।”

এবার শব্দ করে হাসল মণিমালা। রাস্তার গায়েই একটা খাপরার বাড়ি। খাটিয়ায় বসে ভাঙা গলায় একজন রামধুন গাইছিল। মণিমালার হাসির শব্দে রামধুন চাপা পড়ে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে আবার দুজনে পটলবাবুর দোকানের সামনে চলে এল প্রায়। বাসুদেব বলল, “চাঁদুর কাছে আপনি টাকা বার করে আমায় বেইজ্জত করে দিলেন। টাকাটা আমিই পরে দিয়ে দিতে পারতাম।”

“রাখো তো। সামান্য কটা টাকা···তা ছাড়া, আমি তোমার বড়, সঙ্গে রয়েছি, টাকাটা আমি দিলে ও আবার কি ভাববে।”

"ভাবে। সে আপনি বুঝবেন না।"

"দরকার নেই বুঝে।"

বাসুদেব আর বৃথা তর্কের ম'ধ্য গেল না। মণিমালার সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে সে পারবে না। যা খুশি করুক মণিমালা।

পটলবাবুর দোকানের কাছাকাছি পৌঁছে বাসুদেব বলল, "বাড়ি গিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে আমাকে। তার চেয়ে একটু দাঁড়ান আমি খাবারটা নিয়ে আসি।"

"এসো।"

মণিমালা রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল। চলে গেল বাসুদেব।

আজকের বাতাসে দমকা নেই। একইভাবে বয়ে যাচ্ছে ফুরফুরে হাওয়া। ধুলোবালি উড়ছে না। দোকান-বাজার বন্ধ হয়ে এল। পাশের দোকানে তখনও সেই রেডিও বাজছে। মণিমালা আশপাশ দেখতে লাগল। খানিকটা আগেও অল্প কিছু লোকজন ছিল, এখন প্রায় ফাঁকা জায়গাটা।

বাসুদেব সামান্য দেরি করে ফিরল। হাতে শালপাতায় বাঁধা রুটি আর ভাজাভুজি, বাঁ হাতে একটা মাটির ভাঁড়, তরকারি রয়েছে "চলুন।"

মণিমালা পা বাড়াল।

বাজার পেছনে ফেলে কয়েক পা এগিয়ে এসে বাসুদেব বলল, "পটলবাবু আপনাকে দেখেছে।"

ঘাড় ফেরাল মণিমালা। "ভালই করেছে।"

বাসুদেব কি যেন বলতে চাইছিল, পারছিল না। আরও খানিকটা এগিয়ে এসে বলল, "পটলবাবুর দোকানে মহিন্দরবাবু বলে একটা

হারামজাদা বসে ছিল। বেটা আমার সঙ্গে রসিকতা করছিল। উল্লুক একটা।"

মণিমালা কথাটা শুনতে চাইল না। শুধু বলল, "লোকের রসিকতায় কান দিতে হয় নাকি। কারও মুখ আটকানো যায় না, ভাই।"

বাসুদেব বলল, "আমিও বেটাকে মুখের মতন জবাব দিয়েছি।"

সাত

আরও দুটো দিন কাটল।

বাসুদেব অমলেশের কোনো খবর আনতে পারল না। হরিদয়ালবাবু ফেরেন নি। কোথায় গিয়ে বসে আছেন কে জানে। কনট্রাকটার মানুষ, পেটের ধান্ধায় ঘুরে বেড়ান, টুকটাক কাজ চলছে নানা জায়গায়, কোথায় গিয়ে আটক পড়েছেন কে বলবে।

অসুখ বিসুখও হতে পারে যা গরম চলছে। তবে খবরটা হরিদয়ালের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। নানা জায়গায় ঘোরাফেরা তাঁর, নানান জনের সঙ্গে পরিচয়, কুষ্ঠাশ্রমের অল্প স্বল্প কাজ তিনিও করেছেন, কাজেই খবর আনার তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু মানুষটাই যে আসছেন না।

বাসুদেবের মনে হয়েছিল, এই দেরি মণিমালার সইবে না। অধৈর্য হয়ে উঠবে মণিমালা। আশ্চর্য তেমন কোনো অধৈর্যভাব তার দেখা গেল না। অবশ্য মণিমালা নিজেই একবার যাবার কথা তুলেছিল। বাসুদেব রাজী হয় নি।

"সকালের বাসে আপনাকে যেতে হবে। ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধ্যে। এই কাঠফাটা রোদ। গরম, লু। গ্লাস জল খেতে হলেই সেই কুষ্ঠাশ্রমের জল খেতে হবে। না না আপনাকে যেতে হবে না, দিদি।"

"তোমার যে কি কথা। শুধু কুষ্ঠ রোগীরাই কি ওখানে থাকে। ডাক্তার-টাক্তাররা থাকে না? তারা কেমন করে থাকে?"

"যেমন করেই থাক আপনার মিছেমিছি ছুটে গিয়ে লাভ কী। অমলেশ বলে কেউ ওখানে আছে কিনা না জেনে অনর্থক কষ্ট করবেন কেন।"

মণিমালা অবশ্য জেদ ধরে নি। আরও দুটো দিন না হয় দেখাই যাক হরিদয়ালবাবু যদি কোনো খোঁজ আনতে পারেন।

বাসুদেব লক্ষ্য করে দেখছিল, মণিমালা এখানে আশ্রয় পাবার পর থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে কেমন সহজ অন্তরঙ্গ করে তুলছিল। তার আড়ষ্টতা আর বড় চোখে পড়ে না। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতন ব্যবহার। অপরিচিত এক মহিলা কেমন সহজে এবং অবলীলায় এটা পারে কে জানে! এখন যেরকম ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে মণিমালা, বোঝার উপায় নেই যে, বাসুদেব তার নিঃসম্পর্ক।

মণিমালা সত্যি সত্যি নিজের হাতে হাতাখুন্তি ঠেলছে। যে-রান্নাঘর বরাবর ফাঁকা পড়ে থাকত, এখন সেখানে সকালে উনুনের ধোঁয়া ওঠে, জলের বালতি বসানো থাকে একপাশে, অ্যালুমিনিআমের ঘটি, বাটি, হাতা-খুন্তি, কুকারের বাটিতে ছাড়ানো আলুপটল, গুঁড়ো মশলায় দাগ সবই দেখা যায়।

বাসুদেব আর কথা তোলে নি। সাধ হোক বা শখ হোক, মণিমালা যখন বসেছে উনুন জ্বেলে বসুক। এমনও হতে পারে, পটলবাবুর দোকানের খাবার-দাবার মুখে তুলতে পারছিল না। গরমে

অসুখ করে যেত। বাসুদেবের মুখে যা রোচে, মণিমালার রুচবে কেন?

বাসুদেবের আর কি, দু দিনের জন্যে জিবের স্বাদ পালটে নিচ্ছে।

সবচেয়ে মজা হয় সকালে যখন বাসুদেবকে বাজারে যেতে হয়। সকালের চা খাইয়ে মণিমালা বাসুদেবকে খোঁচায়। "মুখুজ্যে-মশাইয়ের কি একটু সময় হবে বাজার যাবার?"

"যাব। এত তাড়া কিসের?"

"তাড়া কেন জানেন না? পরে গিয়ে পচা আলু, শুকনো পটল, পোকা ধরা বেগুন, মাছের লেজ কিনে আনবেন তো। আগে গেলে অন্তত দেখেশুনে আনতে পারবেন।"

বাসুদেব বলে, "ও-কথাটি বলবেন না, দিদি। আমি সংসার করি না বটে, কিন্তু কানা নই। তাছাড়া গরীব ঘরের ছেলে, হাট-বাজার দোকান, দর কষাকষি এ-সব আমাদের বাচ্চাবেলা থেকেই করতে হয়েছে।"

মণিমালা মিষ্টি করে হাসে, ঠাট্টার গলায় বলে, "তা হবে। যা দেখি তাতে অন্য রকম মনে হয়। নবাববাড়ির ছেলেও এমন তালকানা হয় না।"

আসলে বাসুদেব একটু দেরি করেই যেতে চায় বাজারে! ছোট বাজার। পাঁচ সাতটা দেহাতী দোকানদার আলু পটল শাক সব্জি এনে বেচতে বসে। প্রথম দিকটায় সবাই যায়, রেলের স্টাফ, অন্যরাও। বাসুদেবকে বাজারে দেখলেই সবাই কেমন অবাক হয়ে যায়। আইবুড়ো ছেলে, থাকে একা একা, পটলবাবুর দোকানে খায় —সে কেন থলি হাতে বাজারে!

"মুখার্জি, তুমি বাজার করতে এসেছ? ব্যাপার কি হে? স্বপাক

চালাবে নাকি ?”

“না না, দিদি এসেছে কলকাতা থেকে…”

“তোমার দিদি ? নিজের ?”

“না, মাসতুতো দিদি।”

“আচ্ছা।…তা দিদির কি মাছ মাংস চলে ?”

“মাছ-মাংস চলবে না কেন ?”

“তা হলে বংশীর কাছে চলে যাও। অনেক দিন পরে দুটো বড় মৃগেল এনে কেটেছে। একেবারে টাটকা। বারোর বেশী দিও না।”

কালকেই আবার গুডস অফিসের ত্রিলোচনের সঙ্গে দেখা। বাসুদেব উবু হয়ে বসে আলু পটল কিনছে, ত্রিলোচন এসে খোঁচা মারল।

“আরে মুখার্জি, তুম ইধার কিঁউ ?”

“দেখো না—কিঁউ !”

“বেটা তুম ভি ফ্যামিলি ম্যান বন গিয়া। কোন হ্যায় রে উ জানানা ?”

“দিদি।”

“তব তো তুম টেমপোরারি ফ্যামিলিম্যান। সাদী করো বেটা। পারমানেণ্ট হো যাও। টেমপোরারি মে কিয়া ফ্যায়দা।”

ত্রিলোচন বাসুদেবের পাশেই বসে পড়ল। তারপর যত রাজ্যের বকবক।

সকালের দিকটায় বাসুদেব এই জন্যেই বাজার যেতে চায় না। তাকে থলি হাতে বাজারে দেখলেই পাঁচ জনের এত কৌতূহল আগ্রহ বাসুদেবকে কেমন বিব্রত, সঙ্কুচিত করে তোলে। স্পষ্ট করে কেউ না বলুক, আচমকা বাসুদেবের কোয়ার্টারে এক স্ত্রীলোকের আবির্ভাব

অনেককেই কৌতূহলী করে তুলেছে। হয়ত এটা হত না যদি মণিমালার সঙ্গে বাসুদেবের কোনো রকম মিল থাকত। মণিমালাকে দেখলে কি বাসুদেবের দিদি বলে মনে হয়! না। সচ্ছল সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা বলে মণিমালাকে যত সহজে চেনা যায়, ঠিক তত সহজেই বোঝা যায় বাসুদেব একেবারে সাধারণ ছা-পোষা পরিবারের ছেলে। অবশ্য এমন তো হতেই পারে, দুই আত্মীয়ের মধ্যে একজন সচ্ছল, অন্যজন নয়। কিন্তু এই যুক্তি সব সময় কাজে দেয় না।

মনে অস্বস্তি, সঙ্কোচ কখনও বা বিরক্তি যাই থাক বাসুদেব মণিমালার অন্তরঙ্গতায় ক্রমশই মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে যাচ্ছিল। ভালই লাগছিল তার মণিমালাকে।

সেদিন বাজার থেকে ফিরে বাসুদেব ঠাট্টা করে বলল, "কচি একটা লাউ পেয়েছিলাম। নিলাম না।"

"নিলে না কেন?"

"ভাবলাম, আপনি কাটতে পারবেন না।"

মণিমালা ঠোঁট চেপে, গাল কুঁচকে মজার এক ভঙ্গি করল।

বাসুদেব হাসতে হাসতে বলল, "ওই যে বসে বসে কুচকুচ করে কাটা, ওতে আঙুল কেটে যায়।"

"ও। তাহলে আমার আঙুল কাটায় ভয়ে আনো নি। কী আমার ভালবাসার লোক রে।"

মণিমালা কটাক্ষ করে বলল।

বাসুদেব বাজার নামিয়ে পকেট থেকে আরও খুচরো কি বার করছিল। সামান্য যেন লজ্জা পেল। সামলে নিল তাড়াতাড়ি। "দিন, চা-ফা দিন, আজ একটু ওয়াশিং করতে বসব।"

"কি করতে বসবে ?"

"ওয়াশিং। ধোওয়া-ধুয়ি।" বলে কাপড় কাচা সাবানটা দেখাল।

বাসুদেব ঘরে গেল। জামাটামা ছাড়তে।

মণিমালা রান্নাঘরে। কানাইয়া এখনও যায় নি। যদিও বাড়িতে নেই, ফাই ফরমাশ খাটতে গিয়েছে, আবার ফিরবে। কানাইয়াকে বশ করে নিয়েছে মণিমালা, হাতের কাছেই রাখে, ফাই ফরমাশ খাটায়।

আচমকা গানের শব্দ এল। কান ফেরাল মণিমালা। বাসুদেব রেডিও খুলে দিয়েছে ঘরে। বিদঘুটে এক গান হচ্ছিল।

একটু পরেই বাসুদেব বারান্দায় এল। পরনে লুঙ্গি। খালি গা। হাতে দলা করে পাকানো পাজামা গেঞ্জি।

"আজ মাঝে মাঝেই মেঘলা করছে, দেখেছেন ?" বাসুদেব বারান্দা থেকে বলল।

"না, দেখি নি।"

"এবার দু এক পশলা ঝড়বৃষ্টি হবে। যা গরম চলছে।"

"হোক না ভালই তো !"

"হবে। দু একদিনের মধ্যেই। এখানে।"

"হোক না, ভালই তো !"

"তোমার রেডিয়োটা বন্ধ করবে ?"

"পাটনা খুলে রেখেছি। কলকাতা শুনবেন ?"

"না। কিছু শুনব না। বন্ধ করে দাও।"

বাসুদেব রগড়ের গলায় বলল, "ওয়াশিংয়ের সময় আমি একটু হিন্দী গান শুনি। ঠিক আছে বন্ধ করে দিচ্ছি।"

রেডিয়ো বন্ধ করে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে আবার বারান্দায় এল বাসুদেব। "কাল আমার অফ। ছুটি। পরশু থেকে ডে। সকালে অফিস ছুটতে হবে। আপনি বাজার সরকার কোথায় পাবেন?"

"তোমাদের স্টেশনে যারা সকালে ডিউটি করে তাদের বাড়িতে বাজার হয় না?"

"হবে না কেন। ডিউটির মধ্যে এক ফাঁকে বাজার করে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়।"

"তুমিও তাই করবে।"

বাসুদেব হাস্যকর মুখভঙ্গি করল। বলল, "একেই বলে কমলা ছোড়তা মাগর কমলি নেহি ছোড়তি।"

"তা ঠিক," মণিমালা পালটা বলল, "আমি কমলি তোমায় আর ছাড়ছি কোথায়।"

মণিমালা রান্নাঘর থেকে বারান্দায় এল। কাল স্টেশনের টি স্টল থেকে বাসুদেব বন্‌রুটি আর চৌকোণো নোনতা বিসকিট এনেছিল। রুটি এগিয়ে দিয়ে মণিমালা বলল, "তোমার সকালের ডিউটি কত দিন?"

"এক হপ্তা।"

"তারপর?"

"নাইট। মানে সারারাত।"

"তাহলে এর মধ্যে আমি একদিন কুষ্ঠাশ্রম থেকে ঘুরে আসি।"

মুখ তুলে তাকাল বাসুদেব। "যাবেন তো। কিন্তু এই ভীষণ গরমে আপনি যাবেন কেমন করে। বড় কষ্ট হবে দিদি, একদফা ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেলে আপনি পারেন।"

"তুমি তো বলছ ঝড়বৃষ্টি হবে।"

"আমি ভগবান নাকি।" বাসুদেব হাসল। "তবে এ-সময় কালবৈশাখী হয়। চৈত্র মাস।"

মণিমালা চা আনতে রান্নাঘরে গেল।

বাসুদেব রুটি চিবোতে লাগল। আকাশ থেকে থেকে ঘোলাটে হচ্ছে আজ, কখনো বা কিছুটা মেঘলা। এ-রকম প্রচণ্ড গরম চললে ঝড়বৃষ্টি হয়। দিন পনেরো আগে বিকেলের দিকে একবার হয়ে গিয়েছে কালবৈশাখী। তেমন জোরদার হয় নি। তবু হয়েছিল।

চা এনে রাখল মণিমালা।

বাসুদেব বলল, "হরিদয়ালবাবুর যে কী হল কে জানে! অসুখ বিসুখে পড়ে গেলেন নাকি ভদ্রলোক।"

"আটকে গিয়েছেন কোনো কারণে।"

"আমি তো আপনার সঙ্গে যাব ভেবেছিলাম। একা একা আপনি যাবেন।...কাল আমার অফ। কালকেই যেতে হয় তা হলে।"

মণিমালা বলল, "আমার জন্যে সারাদিন কষ্ট ভোগ করবে। বরং, আমি একাই যাই। তুমি আমায় বাসে তুলে দিও।"

বাসুদেব মাথা নাড়ল। "না না, একা যাবেন কেন?"

মণিমালা বাসুদেবের মুখের দিকে দু-পলক তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল, "আমায় অবিশ্বাস হচ্ছে তোমার, ভাবছ—আবার কোথায় পালিয়ে যাব?...না গো না, কোথাও যাব না—ফিরে আসব। জিনিসপত্র পড়ে থাকবে, পালাব কোথায়!"

বাসুদেব রগড় করে বলল, "তা যদি বললেন—তা হলে বলি, পালাতে চাইলে কি আর জিনিসপত্রের জন্যে আপনি পরোয়া করবেন।"

মণিমালা আর দাঁড়াল না।

বাসুদেব চা রুটি খাওয়া শেষ করল। কানাইয়া এসেছিল, গামছায় বাঁধা দু' একটা খুচরো জিনিস। মণিমালার কাছে গিয়ে নামিয়ে রাখল, এটা সেটা ধুয়ে দিল। দিয়ে সকালের জলখাবার নিয়ে চলে যাচ্ছিল, বাসুদেব বলল, আরও দু এক বালতি জল লাগবে আজ।

বারান্দায় বসে বাসুদেব সিগারেটটা আধাআধি শেষ করল। আকাশের ঘোলাটে ভাবের জন্যে আজ এখন থেকেই গুমোট, রোদের তাত কম।

পাজামা, গেঞ্জি নিয়ে বাসুদেব উঠল। কাচাকাচি শুরু করবে।

কলতলার দিকে যেতে যেতে বাসুদেব বলল, "ডালিমগাছটা মরেই যাবে। কচি গাছ, এই রোদ আর সহ্য করতে পারছে না।" কথাটা যেন নিজেকেই বলল।

মণিমালা রান্নাঘর থেকেই শুনল, বাসুদেব জল ঢালাঢালি শুরু করছে।

কিছুক্ষণ কাটল। বাসুদেব কলঘর থেকেই চেঁচিয়ে বলল, "এ শালার আচ্ছা সাবান তো, ফেনাই হয় না।"

মণিমালা শুনল কথাটা।

"দিদি ?"

"বলো।"

"কাল সকালের বাসে আমরা যদি যাই, দুটো ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়ে যাব। নয়ত সারাদিন উপোস।"

"যদি যাই—। সে কালকের কথা।"

"না, আমি—আমি ভাবছিলাম—যদি মেঘলা-মেঘলা থাকে তাহলে বেরিয়ে পড়ব। বরং একটা কাজ করা যেতে পারে। কুষ্ঠ-

আশ্রমে খোঁজ নিয়ে আমরা গোপীগঞ্জ চলে যাব। গোপীগঞ্জের বাস বেশী। ওখানে আমার চেনাশোনা একজন আছে। এখানেই আলাপ হয়েছিল। দুপুরটা সেখানে কাটিয়ে ফিরে আসা যাবে।"

মণিমালা বলল, "যা ভাল বুঝবে করা যাবে।"

আবার চুপচাপ।

কাপড় কাচার শব্দ আসছিল। মনে হল, বাসুদেব যেন হাতের জিনিসগুলো জোরে জোরে আছড়াচ্ছে। হঠাৎ বিচিত্র গলায় গান গেয়ে উঠল—"ধোবিয়াকো বিটিয়া মাথা পর গাঁঠারিয়া, হায় রাম, হায় রাম ধোবিয়াকো বিটিয়া তলাও পর গির গিয়া···।"

মণিমালা প্রথমটায় অবাক হয়ে গিয়েছিল। হেসে ফেলল। রান্নাঘর থেকেই বলল, "হচ্ছে কী?"

"গান গাইছি, দিদি। ফোক সং। ধোবার মেয়ে পা পিছলে পুকুরে পড়েছে!"

"তুমি কি উদ্ধার করতে যাচ্ছ নাকি?"

"না না।" বাসুদেব হাসল।

"আর গাইতে হবে না।"

"বাংলা গাইব?···"

"থামো, গানের দরকার নেই।"

বাসুদেব থেমে গেল। একটু পরেই আবার বিকট গলা করে ডুকরে উঠল।

মণিমালার হাতে আপাতত কাজ ছিল না। বাইরে এল।

"হল কী তোমার?"

"দেখেছেন কাণ্ডখানা। সেদিন দুটো পাজামা করিয়েছি, পায়ের দিকটা ফেটে গেল।"

এগিয়ে গেল মণিমালা কলঘরের দিকে। উঁকি দিল।

বাসুদেব উবু হয়ে বসে, সামনে সাবান-বুলোনো কাপড়চোপড়।

মণিমালা বলল, "প্রাণপণে আছড়াচ্ছ তো ফাটবে না?"

"বেটা পচা কাপড় দিয়েছে। অ্যায়সা জোচ্চর এখানকার লোক-গুলো। ডাহা লোকসান।"

"তুমি সরো, আমি কেচে দিচ্ছি।"

"আপনি?"

"ওঠো তুমি।"

"কি বলছেন আপনি। পাগল নাকি? আমার কাপড় আপনি কাচবেন?"

"তুমি ওঠো।"

"না। অসম্ভব। আমি কেচে নিচ্ছি।"

মণিমালা কলঘরের মধ্যে পা বাড়াল। "দাও আমাকে।"

বাসুদেব দু হাতে তার পাজামা, গেঞ্জি, গামছা আঁকড়ে ধরল, যেন সত্যি সত্যি মণিমালা সব কেড়ে নেবে। "না দিদি, ছি ছি এ-কাজ করবেন না। আপনার পায়ে পড়ি।"

মণিমালা হেসে ফেলল। তারপর যেন রগড় করেই খানিকটা জল বাসুদেবের চোখে মুখে ছিটিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। "ঠিক আছে, তুমি যখন বাড়ি থাকবে না—কেচে রাখব।"

"রাখলে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।"

"হোক," মণিমালা হাসছিল, "নাও আর আছড়াতে হবে না, ধুয়ে ফেলো।"

বেলা বেড়ে যাচ্ছিল। রোদ এসে আবার চলে গেছে। আকাশ

খানিকটা মেঘলা।

মণিমালার স্নান সারা হয়ে গেছে। উঠোনে শাড়িজামা মেলে দিচ্ছিল। বাসুদেব দাড়ি কামাচ্ছিল বারান্দায় বসে।

দাড়ি কামাতে কামাতে বাসুদেব বলল, "দিদি, আপনার শাড়িগুলোর কত দাম?"

উঠোন থেকে বারান্দায় এসে মণিমালা বলল, "কেন।"

"জিজ্ঞেস করছি।"

"শাড়ির দাম জেনে তোমার কী লাভ। যখন জানবার সময় হবে জেনো।"

"সে-সময় আর হবে না," বাসুদেব হালকা মজার গলায় বলল। সেফটি রেজার টানল গালে।

"হবে গো। অত হতাশ কেন?"

"নো চান্স," বাসুদেব মাথা নাড়ল। তারপর উঠোনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার অবস্থাটা দেখুন না। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। তাকান একবার উঠোনের দিকে। চার টাকা মিটারের পচা লংক্লথ আর তিন পঁচাত্তরের গেঞ্জি। পাশে আপনার ওই সব শাড়ি। হানড্রেড, টু হানড্রেড।"

মণিমালা উঠোনের দিকে তাকাল। মেঘলা রোদে প্রায় পাশাপাশি তাদের কাপড়জামা শুকোচ্ছে। চোখে হয়ত মানায় না। কিন্তু···

বাসুদেব কেমন একটা শব্দ করে উঠল।

মণিমালা মুখ ফিরিয়ে দেখে, গালের তলার দিকটা প্রাণপণে চেপে ধরেছে বাসুদেব। কেটে গিয়েছে।

মণিমালা তাড়াতাড়ি পাশে গিয়ে বলল "হাত সরাও তো দেখি।"

হাত সরাতে চাইছিল না বাসুদেব। ধমক দিল মণিমালা। হাত সরাল বাসুদেব। বেশ খানিকটা কেটেছে। রক্ত পড়ছে। শাড়ির আঁচল চেপে ধরল মণিমালা। বেশ জোরেই।

বলল, "লোকের পেছনে লাগলে এই রকম হয়।"

বাসুদেব কথা বলল না। চোখে হাসল। গাল জ্বালা করছিল তার।

আট

শেষ বিকেলের বাসে ফিরে এল মণিমালা।

বাসুদেব বাড়িতেই ছিল। মণিমালার চেহারা, চোখ-মুখের অবস্থা দেখে কথা বলতে সাহস হচ্ছিল না তার। তবু বলল, "দেখা হল?"

মাথা নাড়ল মণিমালা। না।

বাসুদেবের মন-মেজাজও ভাল ছিল না। সকাল থেকেই সে বিরক্ত, ক্ষুব্ধ। আজ তার ছুটি। কথা ছিল, মণিমালার সঙ্গে সে যাবে। তৈরিও হচ্ছিল। হঠাৎ অফিস থেকে লোক এল, মিশ্র শেষ রাত থেকে বমি করতে শুরু করেছে, গায়ে জ্বর, অফিস যেতে পারবে না, বাসুদেব যেন পত্রপাঠ অফিস যায়। খবর পাঠিয়েছেন মাস্টার-মশাই।

বাসুদেবকে ছুটতে হল। প্রকাশ নাইট ডিউটি শেষ করে অফিসেই বসে আছে। বাসুদেব না-যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারছে না।

সকালের দিকে আপ ডাউন দুটো প্যাসেঞ্জার গাড়ি, একটা এক্সপ্রেস যায় বেলা দশটা নাগাদ। প্যাসেঞ্জার গাড়ি দুটোতে রাজ্যের

ভিড় থাকে। দেহাতীর ভিড়। পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে ছুটোছুটি করে লোকগুলো। বুকিং অফিসের সামনে সকাল থেকেই দাঁড়িয়ে থাকে।

মিশ্রর ওপর খেপে গেল বাসুদেব। শালার আর সময় হল না বমি করার। আজই বাসুদেবকে ফাঁসাল। অবশ্য মাথা ঠাণ্ডা থাকলে রাগ করার কারণ থাকত না বাসুদেবের। এ-রকম হয় বইকি। হঠাৎ আটকে পড়লে এ ও কাজ সামলে দেয়, একজনের অসুবিধে অন্যজন দেখে। এমন কি একজনের ডিউটি অন্যজনে করেও দেয়।

অফিসেই ছুটতে হল বাসুদেবকে। তার খারাপ লাগছিল। মণিমালা কী মনে করবে। ছুতো বলে ভাববে না তো?

বাসুদেব অবশ্য বলেছিল দিদি আজ বরং থাক, কাল পরশু যাওয়া যাবে।

মণিমালা রাজী হল না। যখন সে যাবার জন্যে তৈরিই হয়েছে তখন আর দিন পিছিয়ে লাভ কী! তাছাড়া, দিনটাও ভাল, সকালে মেঘলাই রয়েছে।

বাসুদেব আর না করল না। তর্ক করারও সময় নেই তার, অফিস ছুটতে হবে।

যাবার সময় বাসুদেব বলে গেল, আপনি তাহলে আসুন। বাস অফিসে আমি বলে রাখব। ছাড়ার সময় হাজিরও থাকব।

মণিমালা একাই গিয়েছিল। ফিরল সন্ধ্যের মুখে। কালচে চোখ মুখ। গম্ভীর। কেমন যেন থমথম করছে। বাসুদেব সাহস পাচ্ছিল না কথা বলার।

হাতে মুখে জল দিয়ে রান্নাঘরে গেল মণিমালা। জল খেল। তারপর শোবার ঘরে।

অনেকক্ষণ মণিমালার আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

বাসুদেব বারান্দায় বসে। মাঝে মাঝে ঘরের দিকে তাকাচ্ছিল। মণিমালা কি বিশ্রাম করছে? করাই স্বাভাবিক। সকাল থেকে এই প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত ধকল সয়েছে।

আলো যখন মরে ঝাপসা হয়ে আসছে তখনও মণিমালা বাইরে এল না। ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?

বাসুদেব অপেক্ষা করে করে অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। ডাকল মণিমালাকে। কোনো সাড়া নেই।

উঠে পড়ে ঘরের কাছে এল বাসুদেব। "দিদি।"

ঘরে অন্ধকার জমে আসছে। বিছানায় শুয়ে আছে মণিমালা। আধখানা শরীর তক্তপোশের ধার ঘেঁষে ঝুলছে, বালিশে মাথা নেই, কোনাকুনি হয়ে শুয়ে আছে, পাশ ফিরে।

বাসুদেবের মনে হল, ঘুমিয়ে পড়েছে মণিমালা।

ডাকব কি ডাকব না করে আবার একবার ডাকল বাসুদেব। "দিদি?"

সাড়া দিল মণিমালা। অলস গলা, যেন ক্লান্তি আর ঘুমে জড়ানো। অস্পষ্ট।

বিছানায় বারকয় গড়াগড়ি করে ধীরে ধীরে উঠে বসল মণিমালা।

বাসুদেব বলল, "ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?"

"না।"

"ভাবছিলাম, ঘুমিয়ে পড়েছেন। ক্লান্ত লাগছে খুব?"

"লাগছে।"

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বাসুদেব বলল, "আলোটা জ্বেলে দি?"

"থাক, আমি জ্বেলে নেব। উঠছি আমি।"

বাসুদেব আবার বারান্দায় এল। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। সকালের মেঘ দুপুরে সরে গিয়েছিল, বিকেলেও ছিল না, এখন আবার মেঘ জমছে ধীরে ধীরে।

সামান্য দাঁড়িয়ে থেকে বাসুদে' স্টোভ ধরাতে গেল। গা ধুয়ে খানিকটা চা খেলে মণিমালা হয়ত আরাম পাবে খানিকটা।

মণিমালার নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল ঘরে।

বাসুদেব স্টোভ ধরাবার জন্যে ঘরে ঢুকল। হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে নিল আগেই।

স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে বাইরে এল বাসুদেব। এসে দেখল, মণিমালা শাড়ি জামা নিয়ে কলঘরে যাচ্ছে। অলস, ক্লান্ত পা। শরীরটা যেন টলে যাচ্ছে সামান্য।

বারান্দায় সামান্য দাঁড়িয়ে থাকল বাসুদেব। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মণিমালা গেল, ফিরে এল, যে-কাজে গিয়েছিল তা বিফলে গেল, শুধু কি এই কারণেই এমন অবসন্ন, নির্জীব দেখাচ্ছে মণিমালাকে। একটা কথাও তো বলে নি মণিমালা বাসুদেবের সঙ্গে, যেন কথা বলার কোনো আগ্রহই নেই। কী হল কে জানে। অমলেশ কি কোনো দিন ওই কুষ্ঠাশ্রমে ছিল না? নাকি এখন নেই। আর এই অমলেশই বা কে?

কলঘরে জল পড়ার শব্দ হচ্ছিল। মগ মগ জল ঢালছে মণিমালা। হয়ত স্নানই করছে। সারাদিনের গরম, ধুলোময়লা, তাত, ক্লান্তি ধুয়ে ফেলতে চাইছে।

বাসুদেব আকাশের দিকে তাকাল। মেঘ জমছে যদিও তবু অন্য পাশে তারা চোখে পড়ে। চাঁদের আলো একেবারেই অস্পষ্ট। মেঘে ঢাকা পড়ে আসছে। বাতাস কম।

অন্যমনস্কভাবেই বাসুদেব দড়ির খাটিয়াটা উঠোনে নামল অন্য দিনের মতন। ঘর থেকে সতরঞ্জি এনে পেতে দিল।

অমলেশ কে? বাসুদেবের বরাবরই কৌতূহল রয়েছে জানার, কে এই অমলেশ? কে হয় মণিমালার? আত্মীয়? ঘনিষ্ঠ কেউ? ঘনিষ্ঠ অবশ্যই, নয়ত মণিমালা কেন তাকে দেখতে ছুটে আসবে? কিন্তু কি ধরনের সম্পর্ক তার মণিমালার সঙ্গে কে জানে! মণিমালা বলে নি। আজ বাসুদেব মণিমালার সঙ্গে থাকতে পারলে জানতে পারত।

মণিমালা সব দিক দিয়েই রহস্যে নিজেকে আড়াল করে রাখল। নিজের কথা বলবে না, অমলেশের কথাও নয়।

কলঘরে জল ঢালার শব্দ থামল। স্নান শেষ হয়েছে মণিমালার।

বাসুদেব চায়ের জল দেখতে ঘরে চলে গেল। জল ফুটে গিয়েছে এতক্ষণে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাইরে এল বাসুদেব।

মণিমালা উঠোনে শাড়ি জামা মেলে দিচ্ছিল। মাথার চুল পিঠে ছড়ানো।

"চা যে নিয়ে এলাম, দিদি।"

"রাখো, আসছি।"

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বাসুদেব খাটিয়ায় বসল।

মণিমালা তোয়ালে দিয়ে মাথার চুল ঝাড়তে ঝাড়তে তার ঘরে চলে গেল।

অন্যমনস্কভাবে বাসুদেব চা খেতে লাগল।

সামান্য পরে বাইরে এল মণিমালা। তোয়ালেটা তারের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে খাটিয়ার কাছে এসে দাঁড়াল। বাঁ হাতে চিরুনি।

বাসুদেব একপাশে সরে গেল। বসতে জায়গা দিল মণিমালাকে। “চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, আগে খেয়ে নিন। আরও রেখেছি আপনার জন্যে।”

মণিমালা বসল। তার পায়ের কাছে মাটিতে প্লেট ঢাকা দিয়ে চা রেখেছে বাসুদেব। নীচু হয়ে কাপ প্লেট তুলে নিল মণিমালা।

বাসুদেব চুপ করেই থাকল, দেখছিল মণিমালাকে। আচমকা তার মনে হল, কোনো নৈরাশ্য বা বিষাদ যেন তার সমস্ত মুখ মলিন করে রেখেছে। বড় বিষণ্ণ, উদাসীন মুখ।

মণিমালা চায়ে চুমুক দিল। পর পর কয়েকবার।

বাসুদেব কেমন কৈফিয়তের গলায় বলল, “আপনার সঙ্গে আমি যেতে পারলাম না বলে খুব খারাপ লাগছিল। অফিসের ব্যাপার। কিছুই তো করার নেই।...”

“না গিয়ে ভালই করেছ।...আমার এমনিতেই কোনো অসুবিধে হয় নি। তুমি বাসের লোককে বলে দিয়েছিলে, আমায় যত্ন করে নিয়ে গিয়েছে। আবার আসার সময় তুলে এনেছে।”

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বাসুদেব আবার বলল, “ওদিকে কি মেঘলা ছিল?”

“না। মাঝে মাঝে হচ্ছিল।”

“এদিকেও সেই রকম। বিকেলের পর আবার দেখছি মেঘ জমছে।”

মণিমালা ঠাণ্ডা চা তাড়াতাড়ি শেষ করল। “আর আছে?”

“আপনার জন্যে রেখেছি। অনেক ধকল, সয়ে ফিরলেন...।”

“মাথাটা বড় ধরে গিয়েছে,” মণিমালা নিজেই উঠছিল আরও চা ঢেলে আনতে বাসুদেব উঠতে দিল না।

"আমি এনে দিচ্ছি। আপনি বসুন।"

"তুমি দেবে ?···দাও।"

বাসুদেব মণিমালার হাত থেকে চায়ের কাপ টেনে নিল। আপত্তি করল না মণিমালা।

চা নিয়ে ফিরে এসে বাসুদেব কাপটা এগিয়ে দিল। বসল আবার।

মণিমালা সামান্য পিঠ নুইয়ে বসে, ক্লান্তির জন্যেই বোধ হয়। ধীরে ধীরে চা খেতে লাগল।

বাসুদেব কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল। অপেক্ষা করছিল; মণিমালা কিছু বলবে। শেষে আর চুপ করে থাকতে পারল না। "কখন পৌঁছলেন কুষ্ঠ আশ্রমে ?"

"সময় বেশি লাগে নি। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই।" মণিমালা একইভাবে বসে থাকল।

"বড় হাসপাতাল ?"

"বড় !···না বড় কোথায় ?"

"আমি দেখি নি। একবার ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, দূর থেকে দেখেছি—ব্যারাক বাড়ির মতন লম্বা লম্বা ক'টা বাড়ি।"

"হ্যাঁ। ওই রকমই দেখতে।"

বাসুদেব আসল কথায় আসার আগে যেন ভূমিকা করছিল। থামল সামান্য। সিগারেট ধরালো; তারপর মণিমালার দিকে তাকাল। বলল, "ব্যাপারটা কী হল শেষ পর্যন্ত ? অমলেশ বলেই কেউ নেই ?"

মণিমালা ক'মুহূর্ত নীরব। পরে বলল, "ছিল। মারা গিয়েছে।"

চমকে উঠল বাসুদেব। বিমূঢ়। অমলেশ যে কে—জানে না

বাসুদেব, তবু সেই লোকটা মারা গিয়েছে শুনে কেমন যেন লাগল। "মারা গিয়েছে! কবে?"

"মাস ছয় আগে। তাই বলল ওরা।"

জিবে একটা শব্দ করল বাসুদেব আফসোসের। "ছ'মাস আগে! অনেক দিন তাহলে।"

মণিমালা জবাব দিল না। চা শেষ করে কাপটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। মুখ তুলে আকাশ দেখল ক'পলক। তারপর কোল থেকে চিরুনি তুলে নিল।

বাসুদেব বাঁ হাতটা গালে ছোঁয়াল। কাল দাড়ি কামাবার সময় যে-জায়গাটা কেটে গিয়েছিল সেখানে পাতলা করে মলম মাখানো রয়েছে। সামান্য ব্যথা করছিল।

"কী ভাবে মারা গেল?" বাসুদেব জিজ্ঞেস করল মৃদু গলায়।

"অসুখে।"

"কুষ্ঠ রোগে?"

"না। অন্য কী রোগ হয়েছিল।"

বিভ্রান্ত হয়ে বাসুদেব বলল, "উনি কি কুষ্ঠ রোগী ছিলেন?"

"হ্যাঁ। হাসপাতালে তাই বলল। বলল, আগে কোথায় সেবা-টেবার কাজ করে বেড়াত। নিজের অসুখ নিজেই বুঝতে পারে নি। পরে বুঝল।"

বাসুদেব সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল ছুঁড়ে।

মণিমালা মাথার চুলে চিরুনি টানছিল। ঠাণ্ডা বাতাস এল এক ঝলক। আকাশের অনেকটাই এখন অন্ধকার। তারা আর চোখে পড়ছে না।

বাসুদেব নিঃশ্বাস ফেলল। কেন ফেলল, জানে না।

"আপনি গিয়ে পর্যন্ত হাসপাতালেই ছিলেন ?"

"না। হাসপাতালের অফিস থেকে আমায় একজনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। ওখানকার ডাক্তার। মাদ্রাজী। কৃশ্চান। বুড়ো মতন দেখতে।"

বাসুদেব কিছু বলল না।

চুল আঁচড়ে চিরুনিটা ফেলে রাখল মণিমালা। হাই তুলল। পিছন ফিরে হেলে বসল হাতে ভর দিয়ে।

বাসুদেব আরও একটু সরে বসল। "আপনি আরাম করে বসুন না! শোবেন ? বালিশ এনে দেব ?"

"না না, শোব না।"

"শুতে পারেন। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে।"

"না। মাথা ধরার ওষুধটা খেয়েছি খানিক আগে। ছেড়ে যাবে।"

বাসুদেব মণিমালাকে দেখছিল, কেমন যেন নিস্পৃহ, নিরুত্তাপ।

"দিদি ?"

"উঁ !"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?"

"অমলেশের কথা ?"

চুপ করে থাকল বাসুদেব।

মণিমালা নিঃশ্বাস ফেলল, উদাস গলায় বলল, "অমলেশ আমার কে ?...ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেউ নয়, তবে সম্পর্ক ছিল।"

বাসুদেব অনুমান করার চেষ্টা করছিল। করাও যায়। চাপা নরম গলায় বলল, "বন্ধু ?"

ঘাড় ঘোরাল মণিমালা। "বন্ধু!" কয়েক মুহূর্তের জন্যে কেমন

অনিশ্চয়তা, দ্বিধা, তারপর বলল, “হ্যাঁ, তা বন্ধুই বলতে পার।”

কিছু ভাবছিল বাসুদেব। বলল, “আগে আপনি ওঁর কোনো খবর পান নি?”

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মণিমালা আকাশের দিকে তাকাল। মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে সারা আকাশে। “না, ঠিক ঠিক খবর কিছু পাই নি। শুনেছিলাম খারাপ অসুখ করেছে। এই তো মাস দুই আগে হঠাৎ শুনলাম, ও কুষ্ঠ হাসপাতালে রয়েছে।”

বাসুদেব বলল, খানিকটা যেন সান্ত্বনা দেবার গলায়, “আর কিছুদিন আগে খবর পেলে দেখতে পেতেন, তাই না?”

মণিমালা কোনো জবাব দিল না কথার। বাঁ হাতে মাথার চুল সরাল, শব্দ হল চুড়ির। বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, “আগে খবর পেলেই যে ছুটে আসতাম তাই বা কেমন করে বলব! হয়ত আসতাম না।”

অবাক হয়ে গেল বাসুদেব। তার মাথায় কিছু ঢুকল না। আগে খবর পেলে আসত না মণিমালা, এখন এল—এর অর্থটা তার বোধগম্য হল না। বলল, “বাঃ, এ আপনি কী বলছেন? অমলেশকে দেখতেই তো এসেছিলেন?”

মণিমালা মুখ তুলে আকাশ আর অন্ধকার দেখছিল যেন। বলল, “কি জানি!··· ওকে দেখতেই যে আসছিলাম তাই বা কেমন করে বলি! কিছু ঠিক ছিল না। হঠাৎ—হঠাৎই সব হয়ে গেল।”

বাসুদেব এই রহস্যের কিছু বুঝতে পারছিল না। মণিমালার গলায় কোনো আবেগ নেই, ঠাণ্ডা। যাকে দেখতে এসেছিল, তাকে দেখব বলে আসে নি, এই বা কেমন কথা! অদ্ভুত। মণিমালার সবই অদ্ভুত।

কিছু বলতে যাচ্ছিল বাসুদেব, বাধা দিয়ে মণিমালা বলল, "ও-সব কথা থাক না আজ। আমার ভাল লাগছে না।" বলে শোবার মতন করে পেছন দিকে হেলে গেল, হাতে ভর রাখল। "এই সংসারটা বড় অদ্ভুত ভাই। আমাদের মরজিতে চলে না। তুমি ছেলেমানুষ সব কথা বুঝবে না। কত কি হয় আমাদের জীবনে। আজ এক, কাল অন্য-রকম। ওই অমলেশ একদিন অফুরন্ত প্রাণ নিয়ে ঘুরে বেড়াত। কিছুই গায়ে মাখত না। তারপর শুনলাম, বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। শেষে দেখ না কুষ্ঠ হাসপাতালে এসে মরল।"

বাসুদেব আরও একটু সরে গেল। মণিমালা যদি শুয়ে পড়তে চায়, শুয়ে পড়তে পারে।

কোনো সাড়া শব্দ নেই। দু'জনেই নীরব।

ঝোড়ো হাওয়া উঠছে এবার। মাঠঘাট জঙ্গলের দিক থেকে হাওয়া আসছে। মেঠো গন্ধ। ধুলো রয়েছে বাতাসে।

মণিমালা হঠাৎ বলল, "তোমার গালের ব্যথা কেমন আছে?"

"ভাল।"

"আজ আর দাড়িটাড়ি কামাও নি তো?"

"না।"

"ঝড় উঠছে নাকি?"

"হ্যাঁ। দু'একবার বিদ্যুৎ চমকাল।"

"ঝড়বৃষ্টি হোক একটু—কি বলো?"

"হবে বোধ হয় আজ।"

মণিমালা প্রায় শুয়ে পড়ল। আকাশমুখো হয়ে। পা খাটিয়ায় নেই, মাটিতে ঝুলছে।

শুয়ে থাকতে থাকতে মণিমালা বলল, "এবার আমার যাওয়া...।"

বলে সামান্য লঘু স্বরে বলল, "আর তো তোমার ঘাড়ে বসে উৎপাত করতে পারি না। কি বলো? অনেক করেছি।...ক'দিন হলো?"

বাসুদেব চুপ করেই থাকল।

"দিন সাতেক। তাই না?" মণিমালা আঁচলে মুখ ঢাকল। ধুলোবালি শুকনো পাতা কুটো উড়ে আসছে বাতাসে। উঠে বসল। চোখে বোধ হয় ধুলো পড়েছে। আঁচলে চোখ মুছতে লাগল। "বাইরে আর বসা যাবে না। ভেতরে চলো।" মণিমালা উঠে দাঁড়াল।

বাসুদেব খাটিয়াটা বারান্দার তুলে নিল।

আকাশের ঘটা দেখে মনে হচ্ছিল, বৃষ্টি নামল বুঝি।

মণিমালা উঠোন থেকে ভেজা শাড়ি জামা তুলতে তুলতে বলল, "ঘরের জানলা দুটো বন্ধ করে দাও গে, আমি আসছি।"

জানলা বন্ধ করতে এসে বাসুদেব দেখল, ঘর অন্ধকার। টেবিলের ওপর রাখা ল্যাম্পটা নিবে গেছে বাতাসের ঝাপটায়। ঘরে হুহু করে ঝোড়ো বাতাস ঢুকছে, ধুলো-ময়লা।

অন্ধকারেই বাসুদেব জানলা দুটো বন্ধ করল। হাতের কনুইয়ে লেগেছিল সামান্য।

টেবিলের ওপরে কত কি জমিয়ে রেখেছে মণিমালা। গুছিয়েই অবশ্য। সব কিচকিচ করছে ধুলোয়। হাতড়ে হাতড়ে ল্যাম্পটা জ্বালতে গেল বাসুদেব। জ্বলল না। পলতে পুড়ে যাচ্ছে। তেল নেই। বিশ্রী গন্ধ উঠছিল পলতে পোড়ার।

অন্ধকারেই বাসুদেব ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল। দরজার মুখে ধাক্কা খেল মণিমালার সঙ্গে। মণিমালা কাঁধের কাছটায় ধরে ফেলেছিল বাসুদেবের।

"কী হল ?"

"তেল নেই," বাসুদেব বলল।

"তা হলে লণ্ঠনটা আনি। ও-ঘরে রেখে এলাম।"

"আমি আনছি। ও-ঘরে বোতলে তেল রেখেছিলাম। আছে বোধ হয়।"

মণিমালা সরে দাঁড়াল।

ঝড় উঠেছিল প্রবলভাবে। প্রবলতর হয়ে কুলি কোয়ার্টারের চারদিক তছনছ করছিল। কুলি কোয়ার্টারের দিকে হল্লা উঠেছে, একটা মালগাড়ির এঞ্জিন ওয়েস্ট কেবিনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে একটানা সিটি বাজাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকে চমকে, মেঘ ডেকে শেষে বৃষ্টি নামল।

বৃষ্টির মুখে খাটিয়াটা পাশের ঘরে তুলতে পেরেছিল বাসুদেব। বারান্দায় রাখা, মণিমালার শাড়ি জামা ডালিমগাছের কাছে উড়ে গিয়ে জলে লুটোচ্ছে।

ঘরের ধুলো যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে মণিমালা বিছানায় বসে ছিল। বৃষ্টি নামার পর একটা জানলা খুলে দিল। ঠাণ্ডা ভিজে বাতাস এল, জলের ছাটও।

বাসুদেব দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল। পটলবাবুর দোকানে একবার যাবার দরকার ছিল। খাবার-টাবার কিছু আনতে হবে। আজ বাড়িতে কোনো ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এই বৃষ্টিতে কেমন করে বাইরে যাবে কে জানে!

মণিমালা হঠাৎ বলল, "কাল তোমার ছুটি ?"

"হ্যাঁ। মিশ্র কাল অফিস যাবে।"

"তা হলে কালকের দিনটা আমি থাকব। পরশু যাব।"

ঘাড় ঘুরিয়ে বাসুদেব বলল, "কোথায় যাবেন ?"

"দেখি," বলে মণিমালা যেন ঠাট্টা করেই বলল, "তুমি তো আর রাখবে না। অনেক সয়েছ। আর পারবে না।"

নয়

পরের দিন সকালে বাসুদেবেরই ঘুম ভাঙল আগে। ঘরেই শুতে হয়েছিল। কাল ঝড় থামার পরও অনেকক্ষণ বৃষ্টি হয়েছিল। তারপরও বিদ্যুৎ চমকেছে, মেঘ ডেকেছে কতক্ষণ কে জানে।

ঘুম ভেঙে উঠে বাসুদেব বাইরে এসে দেখল রোদ উঠে গিয়েছে। মণিমালা ওঠে নি। তার ঘরের দরজা বন্ধ।

চোখে মুখে জল দিয়ে বাসুদেব খাটিয়াটা আগে ঘর থেকে বাইরে বারান্দায় এনে রাখল ঃ তারপর বসল স্টোভ ধরাতে। স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দিল।

মণিমালার ঘরের দরজা তখনও বন্ধ।

দরজার কড়া নাড়ল না বাসুদেব, শব্দ করল আলগা হাতে।

সাড়া দিল মণিমালা।

এলোমেলো বসন, অলস মন্থর ভঙ্গি, গালে কপালে চুল জড়িয়ে আছে—মণিমালা বাইরে এল, আকাশটা দেখল একবার, তারপর হাই-জড়ানো অলস গলায় বলল, 'রোদ উঠেছে।'

বাসুদেব চায়ের জন্যে ঘরে চলে গেল।

চা খাবার সময় বাসুদেব মণিমালার চোখমুখ লক্ষ্য করল ভাল করে। চোখের কোণ লালচে হয়ে আছে মণিমালার, সামান্য ফোলা

ফোলা, থেকে থেকে হাই তুলছিল।

মণিমালা নিজেই বলল, "আজ যেন শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে!"

"ঘুম হয় নি?"

"অত কড় কড় করে বাজ পড়ছে, কান ফাটা আওয়াজ—প্রথমটায় ঘুম আসছিল না। পরে ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার কখন ঘুম ভেঙে গেল। অনেকক্ষণ জেগে ছিলাম। বোধহয় শেষ রাতেই হবে, আবার ঘুমিয়ে পড়েছি।"

বাসুদেব বলল, "কাল সারাদিন বাইরে ঘুরেছেন, সন্ধ্যেবেলায় অত জল ঘাঁটলেন, রাত্তিরে ঝড়বৃষ্টি—সব মিলেমিশে শরীর খারাপ হয়েছে। ঠিক হয়ে যাবে।"

মণিমালার সঙ্গে কথাবার্তা বেশী হল না। চা শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে বাসুদেব নিজেই বাজারে বেরিয়ে গেল।

মণিমালা বাইরে এসে বসে থাকল।

কানাইয়া কাজে এসেছে। রান্নাঘর শুকনো-শাকনা। কাল সকালে উনুন ধরেছিল অল্পক্ষণের জন্যে। এঁটো বাসনপত্র ছিল সামান্য। বিকেলে কাজে এসে ধুয়ে মুছে রেখে গিয়েছে কানাইয়া। যেমন রেখে ছিল সেই রকমই পড়ে আছে সব। ঝড়ের কিছু ধুলোবালি ছাড়া রান্নাঘরে আর কিছু ঢোকে নি।

মণিমালা অবশ্য রান্নাঘর পরিষ্কার করে দিতে বলল।

কানাইয়া লোহার ছোট উনুনটা সদরের বাইরে নিয়ে গিয়ে ধরিয়ে দিল। দিয়ে কাজ নিয়ে বসল।

মণিমালা বারান্দায়। খাটিয়ার ওপর বসে আছে।

সকালের রোদ অন্যদিন কত তাড়াতাড়ি তেতে উঠতে শুরু করে। আজ এখনও তেতে ওঠে নি। আকাশ কোথাও কোথাও সাদা,

কোথাও বা নীল। দু এক টুকরো ধোঁয়া মেঘও চোখে পড়ে। হয়ত বেলা বাড়লে আবার মেঘলা হবে। কিংবা আকাশ তামাটে হয়ে রোদ খর হয়ে উঠবে।

উঠোনে এক ঝাঁক চড়ুই নেমেছে, দুটো কাকও সমানে ডাকছে। আগে উঠোনে এত চড়ুই কিংবা কাকের নাচানাচি মণিমালা দেখে নি। এখন উচ্ছিষ্টের লোভে নামতে শুরু করেছে। সেই বেড়ালটাও সদর খোলা পেলেই ঢুকে পড়ে।

কালকের ঝড়বৃষ্টিতে উঠোন বেশ ময়লা হয়েছে। ধুলো আর জল শুকিয়ে কাদার দাগ ধরেছে কোথাও কোথাও। ডালিম গাছটার তলায় ছেঁড়া পাতা, তারই একপাশে মণিমালার জামা জলে কাদায় চুপসে পড়ে আছে। কাল শাড়িটা কোনো রকমে উদ্ধার করা গিয়েছিল : সায়া, জামা, নিচের জামা নয়। সায়াটা আজও চোখে পড়ল না।

মণিমালা বসেই থাকল। ওঠার গরজ নেই। কানাইয়া আসছে, যাচ্ছে, কাজ করছে—, মাঝে মাঝে মণিমালা তাকে এটা ওটা করতে বলছিল।

বাজার থেকে ফিরল বাসুদেব।

মণিমালা রান্নাঘরে।

বাসুদেব থলিটা নামিয়ে দিয়ে বলল, "লোকে বলছে থানার দিকে একটা বড় তেঁতুলগাছ ছিল। কাল তার মাথায় বাজ পড়েছে।"

মণিমালা বলল, "তা হতে পারে। ঘুমোবার আগে ভীষণ শব্দ করে একটা বাজ পড়ল। মনে হল যেন পাশেই কোথাও পড়েছে। তুমি শুনতে পাও নি শব্দটা ?"

"শুনেছি, বুঝতে পারি নি।"

"ঘুমিয়ে পড়েছিলে ?"

"বোধ হয়।"

বাসুদেব আর রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াল না। কলতলায় গিয়ে হাত ধুয়ে খাটিয়ায় গিয়ে বসল। বসে ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল।

আজ তার ছুটি। গতকালের ছুটিটা আজ পাচ্ছে। আজ সারাদিনই বাড়িতে। কী করবে সারাদিন ? আগে, ছুটির দিন বাসুদেব নিয়োগীদার কোয়ার্টারে গিয়ে খানিক গল্পগুজব করত, বাজারে পটলবাবুর দোকানের সামনে চায়ের আড্ডা বসে, সেখানে বসে আড্ডা মারত কিছুক্ষণ, বাস অফিসের কেশবের কাছে কাগজ থাকে, একবার গিয়ে কাগজটা দেখত, তারপর স্টেশনেও চক্কর মেরে আসত একবার। দুপুরটা খেয়ে, গড়িয়ে, রেডিয়ো শুনে, একই গল্পের বই বা পুরোনো কোনো কাগজ নতুন করে পড়ে কেটে যেত। বিকেলে সামান্য ঘোরাঘুরি। সন্ধ্যেবেলায় তাস। তাসের আড্ডাটা বাসুদেবের বাড়িতেই জমত। শর্মা, কেশব, ঘোষবাবু—জুটে যেত ঠিক। ছুটি বলে কথা নয়, সন্ধ্যেবেলায় ফাঁকা থাকলে বরাবরই তাসের আড্ডাটা জমেছে। মণিমালা আসার পর, এই ক'দিন বন্ধ। আবার পরশু তরশু থেকেই তাস বসবে। তাস বসবে, রেডিয়ো বাজবে, ইয়ার-বন্ধুদের হো-হো শোনা যাবে। পানের পিচ পড়ে পড়ে নালাটায় দাগ ধরে যাবে।

আগে যা ছিল সবই ফিরে আসবে, কিন্তু এই ক'দিন—সাত আটটা দিন হঠাৎ সব কেমন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। উঠোনে শাড়ি জামা ঝুলছে, রান্নাঘরে হাতাখুন্তির শব্দ, বাসুদেবের শোবার

ঘরে মেয়েলী টুকিটাকি, কলতলায় মণিমালার সাবানের, মাথার তেলের গন্ধ। এই বাড়িতে মেয়েলী গলার হাসাহাসির, খুনসুটির যে অন্তরঙ্গ শব্দ উঠত, তাও আর উঠবে না।

মণিমালার গলা শুনল বাসুদেব। মুখ তুলল।

"এটা কি এনেছ গো ? কে খাবে ?"

"কী ?"

"ছোট হাঁড়িতে ?"

"কালোজাম।···এখানে বলে কালাজামুন। আপনি খাবেন।"

"কেন, আমি খাব কেন ? ···তুমি বুঝি আমায় তাড়াবার খাওয়া খাওয়াচ্ছ। · খুব আনন্দ। না ?"

বাসুদেব জবাব দিল না।

মণিমালা রান্নাঘর থেকেই বলল, "একটু কাজ করো। কনডেন্সড্ মিল্কের টিনটা আনতে ভুলে গেছি। এনে দাও তো!"

উঠল বাসুদেব। ঘরে গিয়ে দুধের টিনটা নিল। মণিমালা আসার পর এই ঘরটাও তকতকে হয়ে উঠেছিল। কানাইয়াকে দিয়ে রোজ ঘর মোছাত, এলোমেলো নোংরা হয়ে যা পড়ে থাকত বরাবর, সবই একদিকে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে মণিমালা। কাঠের বাক্সটাও কত সাফসুফ দেখায়।

দুধের টিন নিয়ে বাসুদেব রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

টিনটা হাত বাড়িয়ে নিল মণিমালা। "এটা নিয়ে যাও। আমি চা নিয়ে আসছি।"

"এ কি! এত ?"

"আজ তো ছুটির দিন! খেতেও বেলা হবে।"

"আমি আপনার জন্যে এনেছিলাম।"

"আমি তো রাক্ষস না। নিয়ে যাও।"

কাচের প্লেট হাতে বাসুদেব ফিরে এল আবার। সকালের খাওয়া নিয়ে তাদের কোনো বাদবিচার নেই, যা জুটল তাই, জিলিপি, কুচো নিমকি, সিঙ্গাড়া, বন্রুটি, মুগের লাড্ডু।

বাসুদেব তার খাটিয়ায় ফিরে এসে বসল।

সামান্য পরেই চা নিয়ে এল মণিমালা। নামিয়ে রাখল। আবার চলে গেল রান্নাঘরে। নিজের চা খাবার নিয়ে ফিরে এল।

খাটিয়াতেই বসল মণিমালা।

অল্পক্ষণ কোনো কথাবার্তা হল না। শেষে মণিমালা বলল, "তোমার ওই হাঁড়িকুড়ি আবার বাক্সে ভরে নেবে নাকি?"

মাথা নাড়ল বাসুদেব। "হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি!"

"আমি বলি কি, তুমি নিজেও তো মাঝেসাঝে হাত পোড়াতে পার। কানাইয়াকে আমি টুকটাক শিখিয়ে দিয়েছি।"

"ও-সব পোষাবে না। চাকরি করব, না, ভাতের ফেন গালব?"

"বাঃ, নিজেই তো বলেছ, হাত পোড়ানোর অভ্যেস তোমার আছে।"

"সে দায়ে পড়লে! এখানে আমার কি দায়!"

মণিমালা খেতে খেতে কথা বলছিল। চায়ের কাপটা তুলে নিল, ছোট করে চুমুক দিয়ে আবার নামিয়ে রাখল। "পটলবাবুর দোকানের খাবার বরাবর যদি তুমি খেয়ে যাও, তোমার অসুখ করবে। ··শরীরও টিকবে না।"

"না টিকলে কি আর করা যাবে—" বাসুদেব হাসির ভাব করল।

মণিমালা কয়েক পলক দেখল বাসুদেবকে। তারপর ঠাট্টার গলায় বলল, "তা হলে একটা বিয়ে করো, বাপু।"

বাসুদেব শুকনো করে হাসল।

কয়েকটা ফড়িং বারান্দায় উঠোনে উড়ে বেড়াচ্ছিল। বৃষ্টি হবার পর ফড়িংও মাঠ থেকে উঠে এসেছে। রোদ এখনও চাপা-চাপা হয়ে আছে।

মণিমালা বলল, "আজ বিকেলে একটু বেড়াতে নিয়ে চলো না ?"

"বেড়াতে! কোথায় ?"

"কোথায় আবার কি! তোমাদের এখানে বেড়াবার জায়গা নেই ?"

"জায়গা বলে কিছু নেই, তবে রাস্তা, মাঠ, গাছপালার জঙ্গল, স্টেশন রয়েছে··· ।"

"ওতেই হবে। আমি পাহাড়, সমুদ্র চাইছি না।"

বাসুদেব কি ভেবে বলল, "যাবেন তা হলে। তবে অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আজ বিকেলেও ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।"

মণিমালা আকাশের দিকে তাকাল। কোথাও কোনো লক্ষণ নেই ঝড়-জলের। বরং আজ আবহাওয়া অনেক ভাল। গরমও কম লাগছে।

"তুমি কি হাত গুনে বলছ ?" মণিমালা ঠাট্টা করে বলল।

"না। এই সময় ঝড়-বৃষ্টি হলে, দু-একদিন পর পর হয় দেখেছি, তাই বলছি।"

মণিমালা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "তা হোক।"

বেলা বাড়তে লাগল। বাসুদেব বাড়িতেই বসে থাকল। একবার ভেবেছিল, কোথাও গিয়ে খানিকটা সময় কাটিয়ে আসবে, নিদেনপক্ষে চুলটা কেটে আসা যাক, শেষ পর্যন্ত তার কোথাও যেতে ইচ্ছে করল

না। বরং মণিমালার কাছাকাছি থাকতেই তার ইচ্ছে করছিল।

কখনও ঘরে গিয়ে অকারণ কিছু নাড়াচাড়া করে সময় কাটাচ্ছিল, কখনও বাইরে এসে দাঁড়াচ্ছিল। কথা বলছিল মাঝে মাঝে। সাধারণ কথাবার্তা। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল, অন্যদিনের সেই স্ফূর্তি, হাসাহাসি বাসুদেবের নেই। গলার স্বরও নেমে আছে।

মণিমালাও তার হাতের কাজ সেরে নিচ্ছিল।

দাড়ি কামাতে বসল বাসুদেব। গালের কাটাটুকু এখনও পুরো-পুরি শুকোয় নি।

মণিমালা বারান্দায়। স্নানে যাবে। মাথায় চুল পরিষ্কার করে নিচ্ছিল।

"দেখো, আজ আবার গাল কেটে বসো না," মণিমালা হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে বলল।

"না", বাসুদেব আয়নায় নিজের মুখ দেখছিল।

"তোমার মাথার কাছে ওটা কি উড়ছে?"

আয়না রেখে বাসুদেব ওপরে তাকাল। একটা ভোমরা উড়ে এসেছিল কোথা থেকে, মাথার অনেকটা ওপরে পাক খাচ্ছিল। বার কয়েক পাক খেয়ে মণিমালার দিকে উড়ে যেতেই সরে গেল মণিমালা। ভোমরাটা উড়ে উঠোনে চলে গেল। উঠোনে উড়ল, যেন পথ ভুল করে এসে পড়েছিল, তারপর পাঁচিলের মাথা টপকে চলে গেল কোথায়।

মণিমালা ঘরে ঢুকল।

বাসুদেব দাড়ি কামানো ব্রাশটা জলে ভেজাতে লাগল।

"তোমার এই টিনের চেয়ারটা পালটে নিও," মণিমালা ঘরের ভেতর থেকে বলল, "বিচ্ছিরি খোঁচা হয়ে রয়েছে পিঠের দিকে।"

জবাব দিল না বাসুদেব। গালে সাবান ঘষছে। কাটা জায়গাটায় ব্যথা রয়েছে এখনও।

শাড়ি, জামা, তোয়ালে, সাবান নিয়ে বাইরে এল মণিমালা। "তুমি আজ এত চুপচাপ কেন গো, মুখার্জিবাবু?"

বাসুদেব ব্লেড লাগাচ্ছিল সেফটি রেজারে। তাকাল একবার। "চুপচাপ! কই?"

"উহুঁ! আজ কেমন চুপচাপ, গম্ভীর।"

"কোথায়?"

মণিমালা বাসুদেবের একেবারে গায়ের পাশে এসে দাঁড়াল। "আমি তো দেখছি। শরীর খারাপ?"

"না। শরীর খারাপ কেন হবে?"

"তবে কী? মন খারাপ?" ঠাট্টার গলায় বলল মণিমালা।

বাসুদেব মুখ ফিরিয়ে ঘাড় তুলে মণিমালাকে দেখবার চেষ্টা করল। কিছু বলল না। কথাটা যে হাসির তা বোঝাবার জন্যে শব্দ করল, হাসির শব্দ।

"মন যদি খারাপ না হয়—" মণিমালা পরিহাসের গলায় বলল, "তবে তোমার মন নিশ্চয় ভাল। মন ভাল থাকার মতন কিছু করছ না কেন!"

"কী করব?"

"কেন, কত কি করার থাকে তোমার। অন্তত সেই ধোপার মেয়ের গানটাও তো গাইতে পার।" মণিমালা রগড় করে বলল।

বাসুদেব সাবধানে দাড়ি কামাতে লাগল।

আর দাঁড়াল না মণিমালা, স্নানে চলে গেল।

মন কি খারাপ বাসুদেবের? খারাপ নয়, তবু কেমন যেন

লাগছে। মণিমালার সঙ্গে এই ক'টা দিন ভালই কেটেছিল। বাসুদেব ঠিক বোঝাতে পারবে না, তবে তার মনে হয়েছে, বাইরে—অফিসে কিংবা বাড়িতে তার যেসব বন্ধুরা গল্পসল্প করে, আড্ডা মারে, তাস খেলে তাদের সঙ্গে যে-ধরনের ঘনিষ্ঠতা, মেলামেশা—মণিমালার সঙ্গে তার এই সাত আট দিনের অন্তরঙ্গতা সে-ধরনের মোটেই নয়। সাধারণ বন্ধুত্ব, মোটামুটি ভাল লাগা কিংবা পছন্দ করার ব্যাপার এটা নয়। এর ভেতরে কী যেন রয়েছে, মণিমালা মেয়ে বলেই কি এই আকর্ষণ? কিন্তু বাসুদেব কি সেই মন নিয়ে দেখেছে মণিমালাকে। না কি মণিমালা তাকে সেই চোখে দেখেছে! মানুষের মন এবং চেতনার মধ্যে এমন কিছু আছে যা গাছপালার শেকড়ের মতন। ভেতরে ভেতরে ছড়িয়ে যায়।

এ-সব ছাড়াও বাসুদেব অন্য-এক ব্যাপারে বিমর্ষ বোধ করছে। মণিমালা যে-রহস্য নিয়ে এসেছিল আচমকা, প্রায় সেই রহস্য নিয়েই ফিরে যাচ্ছে। তাকে জানা গেল না। চেনা হল না। মণিমালা চলে যাওয়ামাত্র বাসুদেব তাকে ভুলে যাবে না। মনে পড়বে, হয়ত প্রায়ই, বহুদিন—কিন্তু এই মণিমালা তার অজানাই থেকে যাবে।

কলঘরে জল পড়ার শব্দ। মাঝে সাঝে বালতি সরানোর, টিনের গায়ে মগ লেগে যাবার ঠক্ করে আওয়াজ আসছে, গলায় জল নিয়ে গলগল শব্দ করল মণিমালা, হাত থেকে জল ভরতি মগ পড়ে যাবার শব্দ হল জোরে।

তারপরই মণিমালা কেমন 'যাঃ' করে উঠল।

বাসুদেব অপেক্ষা করতে লাগল। কী হল?

কলঘরে আর কোনো শব্দ উঠছে না।

বাসুদেব দাড়ি কামানো শেষ করল। কাটা জায়গাটা বাঁচিয়েছে।

ব্রাশ, রেজার ধুয়েটুয়ে ঘরে রেখে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকল।

মণিমালা বেরিয়ে এল কলঘর থেকে। আজ কেমন অগোছালো হয়ে। শুকনো শাড়িটা কোনোরকমে গায়ে জড়ানো। হাত ফাঁকা।

ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল মণিমালা।

সকালের আকাশটা পালটে যাচ্ছে। নীলের ভাব না থাকার মতন। রোদ প্রখর হয়ে উঠেছে। গরম বাড়ছে। গুমোটও। বাতাস নেই।

বাসুদেবের তেষ্টা পেয়েছিল। জলের কুঁজোটা রান্নাঘরে।

জল খেতে গিয়ে বাসুদেব উনুন, বাসনপত্র, হাতাখুন্তি, তেলের টিন, এটা-সেটা লক্ষ্য করল। উনুনে কিছু চাপানো রয়েছে, ধোঁয়া উঠছে ঢাকনার পাশ দিয়ে, নালির মুখটায় জল, হলুদের দাগ, একটা কাগজের ওপর আলু পটলের খোসা, এক সারি কালো পিঁপড়ে দেওয়াল বেয়ে চলে যাচ্ছে। বাসুদেবের মনে হল, সাধারণ এবং সামান্য কটা সাংসারিক জিনিস যেন কেমন একটা জীবন্ত ভাব এনে দিয়েছে রান্নাঘরটায়। কাল আবার সব ফাঁকা হয়ে যাবে। এই মুহূর্তটা মরে যাবে।

হাসি পেল বাসুদেবের। বড় বয়েসেও মানুষ খেলা করে। এটা খেলা। মণিমালার।

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল উঠোনে।

বাসুদেব তাকাল। মণিমালা কলঘরের দিকে যাচ্ছে। শাড়িটা পালটেছে আবার। বারান্দায় ফিরে এল বাসুদেব।

মণিমালা ভিজে কাপড় জামা এনে মেলে দিতে লাগল উঠোনে।

বাসুদেবের কি খেয়াল হল, ঠাট্টা করে বলল, "দফায় দফায় শাড়ি পালটাচ্ছেন, কী ব্যাপার?"

মণিমালা বলল, "বলো না, শুকনো শাড়িটা জলে পড়ে গিয়েছিল। বাথরুমটা যা ছোট।"

বাসুদেব কিছু না ভেবেই বলল, "মানুষ ছোট, দিদি। ছোট মানুষের ছোট বাথরুম।"

কথাটা শুনল মণিমালা। কোনো জবাব দিল না। উঠোনে কাচা কাপড় মেলে দিয়ে ঘরে গেল, আবার ফিরে এল সঙ্গে সঙ্গে, জলে-পড়ে যাওয়া শাড়িটা নিয়ে। মেলে দিল।

সবই দেখছিল বাসুদেব। কলঘরে আর জল থাকার কথা নয়। কানাইয়া এসে আবার এক আধ বালতি জল দিলে স্নান করতে যাবে সে।

মণিমালা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

হাতের কাজ সেরে ফিরে এসে ডাকল বাসুদেবকে। "শোনো।"

ঘরে এসে মণিমালা বলল, "ঠেস দিয়ে কথা বলতে বেশ লাগে, না?"

"ঠেস দিলাম! কই?"

"ন্যাকামি করো না।···ছোট মানুষের ছোট বাথরুম···আমি কালা নাকি?"

বাসুদেব হেসে ফেলল। "কথাটা মিথ্যে বলেছি? আপনিই বলুন।"

মণিমালা চুল আঁচড়াবার জন্যে তার চিরুনিটা তুলে নিল। জানলা খোলা। ঘরে রোদ ঢোকে নি, আরও খানিকটা বেলায় ছোট জানলা দিয়ে রোদ আসবে। আলো প্রচুর। বাইরে দুটো ছাগল চরে বেড়াচ্ছে, তেঁতুলগাছের তলায় ছায়ায় বসে জনা দুই লোক বিড়ি খাচ্ছে আর কথা বলছে। গাড়ি আসছে লাইনে।

মণিমালা বলল, "ছোট মানুষ বড় মানুষের তুমি কিছু জান?"

"কেন জানব না। বাসুদেব হাসি মুখেই বলল, "যেমন ধরুন আপনি আর আমি।"

মণিমালা মাথার চুলে চিরুনি টানতে লাগল। ততক্ষণে গাড়ি কাছাকাছি এসে গেছে। শব্দ আসছিল।

মালগাড়িটা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল মণিমালা। তারপর বলল, "বাইরে থেকে দেখে তুমি আমায় বড় মানুষ ভাবছ! শাড়ি জামা দেখে।"

"বাঃ! সেটাও তো দেখার। তা ছাড়া আপনার···"

বাধা দিল মণিমালা। বলল, "তোমার চোখ ভাল।···যাক, আমি যদি ছোট হতে পারতাম, তোমার মতন, সুখী হতাম।"

বাসুদেব হাসল। "সেই যে কি বলে না—নদীর এ-পার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ··আপনার হয়েছে তাই। সুখে আছেন, সুখে থাকতে থাকতে অরুচি ধরে গেছে। তাই একটু শখ করে এই দুঃখ-কষ্ট···" কথাটা শেষ না করেই বাসুদেব থেমে গেল।

মণিমালার হাত থেমে গিয়েছিল। দেখছিল বাসুদেবকে। অপলকে।

কিছুক্ষণ পরে মণিমালা বলল, "তা ঠিক। শখ করতে বেরিয়েছিলাম; শখ ফুরিয়েছে। কিন্তু ভাই, তোমার এই ঘর কেড়ে নেওয়া ছাড়া তোমায় কি আর কোনো কষ্ট দিয়েছি?" নিঃশ্বাস ফেলল মণিমালা।

কষ্ট? বাসুদেব মাথা নেড়ে, অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলতে যাচ্ছিল—না, না কষ্ট আবার কোথায় দিলেন, বরং ভালই তো কাটালাম ক'দিন —বলতে গিয়েও মুখে কথা আটকে গেল, কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে

পড়ল, ফাঁকা লাগল, কষ্টই লাগছিল তার।

মণিমালা বলল, "তোমার এই ঘর, বিছানা, বাড়ি—সবই তুমি কাল ফেরত পাবে। কষ্টটুকু ভুলে যেও।…"

বাসুদেব মুখ নীচু করে নিল।

দশ

"ওটা কি গো?"

"কোনটা? ওই আমলকি ঝোপের পাশে?"

মণিমালা আঙুল তুলে দেখাল। আমলকি ঝোপের পাশে ভাঙাচোরা খাঁড়ের মতন কিছু একটা। খোলার চাল নুয়ে এসেছে, বুনো লতা উঠেছে চালে, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল না ফল বোঝা যায় না, সোঁদা গন্ধ, চারদিকে আগাছার জঙ্গল।

তবু চোখে পড়ার মতন বই কি! এ দিকটায় যতদূর চোখ যায় শুধু মাঠ, কোথাও ঢালু হয়ে নেমেছে, কোথাও উঠেছে, মাঝে-মধ্যে গাছপালা, নয়ত আগাগোড়া রুক্ষ, পাথর নুড়ি ছড়ানো অনেক দূরে জঙ্গলের গাছপালা। এত দূর থেকে জঙ্গল দেখা যায় না, অন্তত এখন এই শেষ বিকেলে, যখন হু হু করে মেঘ এসে ক্রমশই সব মেঘলা করে দিচ্ছে। এমন ফাঁকায় এই অদ্ভুত বাড়ি চোখে পড়ার মতনই। ইট নজরে পড়ে না, বড় বড় কালচে পাথর চোখে পড়ে, যেন পাথর সাজিয়ে কোনো কালে কেউ বাড়ি করেছিল, মাথায় ছিল খোলার চাল। দরজা জানলার কাঠকুটো হয় খুলে নিয়ে গিয়েছে, না হয় পোকায় ধরে নষ্ট হয়েছে। এক আধটা ভাঙা খড়খড়ি ঝুলছে এখনও।

দেখলে মনে হয়, লতাপাতা, ঝোপ, কয়েকটা কলকে ফুলের গাছের মধ্যে কবেকার এক শখের তৈরী পাথরের স্তূপ পড়ে আছে।

বাসুদেব বলল, "জানি না। বোধ হয় কেউ শখ করে বাড়ি করছিল…।"

"পাথরের বাড়ি?"

"এদিকে এ-রকম হয়। আগে রেল কোম্পানীই কত পাথরের বাংলো, কোয়ার্টার তৈরি করেছে।"

মণিমালা পা-পা করে এগিয়ে সামনে গেল বাড়িটার। আগাছায় পথ বন্ধ! সিঁড়ির মুখের সামান্য বারান্দা আর সামনের ঘরের ভাঙা জানলা দেখা যাচ্ছিল। কে যেন একটা ভাঙা গরুর গাড়ির চাকাও তুলে রেখেছে বারান্দায়।

বাসুদেব বলল, "গরমের দিন। সাপখোপ রয়েছে কোথায়, আর এগুতে হবে না। চলুন ফিরি।"

মণিমালা এগুলো না। উপায় নেই। ফিরে এল।

"এদিকে আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। ফিরতে হবে এবার।"

"এখনই?"

আকাশের দিকটা দেখাল বাসুদেব। "অবস্থাটা দেখুন।"

মণিমালা আকাশ দেখতে দেখতে বলল, "কালকের মতন ঝড় উঠবে? কাল সন্ধ্যের পর এসেছিল।"

"আজ সন্ধ্যের আগেই আসতে পারে।"

"না, উড়েও যেতে পারে মেঘ। কেমন সাঁতার কেটে আসছে দেখেছ!"

বাসুদেব হেসে বলল, "আমাদেরও সাঁতার কেটে বাড়ি ফিরতে

হবে, দিদি। যদি ছুটি তা হলেও মিনিট পনেরো । হেঁটে গেলে অন্তত মিনিট পঁচিশ।"

হাঁটছিল মণিমালা। রাস্তা বলে কিছু নেই, মাঠের ওপর দিয়ে গরুর গাড়ি যাবার পথ। অন্ধকার হয় নি; ঘন মেঘলার মতন হয়ে আছে চারদিক। দু-একটা দমকা বাতাস ছাড়া আবহাওয়াটা এখনও গুমোটই লাগছে।

অনেকটা তফাতে রেললাইন। এখান থেকে দেখা যায় না। অনুমান করা যায়।

মণিমালা বলল, ঠাট্টা করেই, "এখন ঝড় এলে তুমি কি করবে?"

"ছুটবো।"

"আমায় ফেলে রেখে?"

"আপনিও ছুটবেন।"

"তারপর মরি আর কি মুখ থুবড়ে পড়ে।" মণিমালা হালকা পায়ে, সহজ ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল।

বাসুদেব কিছুই বুঝতে পারছিল না। মেঘ যেমন করে ভেসে আসছে তাতে আর খানিকটা পরেই সব কালো হয়ে যাবে। অথচ ঝড়ের হাওয়া আসছে না, বৃষ্টির কোনো গন্ধ ভেসে আসছে না জঙ্গলের দিক থেকে। ঝড় আসবে কি আসবে না বোঝা মুশকিল।

মণিমালা বলল, "তুমি কখনও ঝাঁঝা গিয়েছ?"

"থাকি নি। দেখেছি।"

"আমরা ছেলেবেলায় অনেক দিন ঝাঁঝায় ছিলাম।"

তাকাল বাসুদেব। নিজের সম্পর্কে, মণিমালার বোধ হয় এই প্রথম কথা। বাসুদেব বলল, "কে ছিল ঝাঁঝায়? আপনার বাবা?"

"বাবা!...না বাবা কোথায়। দাদুর বাড়ি ছিল ঝাঁঝায়। আমরা

দঙ্গল হয়ে সেখানে থাকতাম।”

‘দঙ্গল হয়ে থাকত’ বলতে কি বোঝাল মণিমালা বুঝতে পারল না বাসুদেব। অনেকে মিলে থাকত? অনেক বড় পরিবার ছিল ওদের?

বাসুদের বলল, “বাবা কোথায় থাকতেন?”

“বাবা! বাবা তখন যুদ্ধে।”

“যুদ্ধ? কিসের যুদ্ধ?”

মণিমালা মুখ তুলে দেখল বাসুদেবকে। “তুমি বোধ হয় তখন জন্মাও নি। আমিই কত ছোট ছিলাম। আজকের কথা! চার পাঁচ বছর বয়েস তখন আমার। ইংরেজদের রাজত্ব চলছে তখনও।”

বুঝতে পারল বাসুদেব। বলল, “ও সেই যুদ্ধ!…গল্প শুনেছি।”

“আমারও তাই মনে হয়। তা ঝাঁঝায় বাড়ি তো বড় ছিল না, আমরা সবাই ঝাঁঝায়। মা রয়েছে আমাদের দুই বোন নিয়ে, মাসী পালিয়ে এসেছে গৌহাটি থেকে তিন চারটে ছেলেপুলে সমেত। মামা তখন কলকাতায় কাজকর্ম করত, চলে এসেছে। বাড়িতে গিজগিজ করছে লোক। শোবার জায়গা জুটত না; বারান্দায়, সিঁড়ির ঘরেও শুতে হত।…কিন্তু হই-হল্লা করে, মা-মাসীর চড় চাপড় খেয়ে দিব্যি কেটে গেছে ভাই দিনগুলো।”

খুবই আচমকা, যেন আশপাশে বসে থাকা ধুলোর দমকা ঘূর্ণির মতন মাঠ দিয়ে ছুটে এসে ঝাপটা দিল বাসুদেবদের। চোখ বুজে ফেলল বাসুদেব।

“একটু তাড়াতাড়ি পা চালান, দিদি।”

পা চালানো দূরে থাক, মণিমালা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। নাকে চোখে ধুলো ঢুকেছে। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ধুলো পরিষ্কার করছিল।

"কী হল ?"

"দাঁড়াও, তাকাতে পারছি না।"

"অবস্থা কিন্তু ভাল নয়, আকাশ ঘুটঘুটে হয়ে গেছে।"

"যাক," চোখ রগড়াতে রগড়াতে মণিমালা বলল, "বৃষ্টি এলে ভিজবো এই তো, তা না হয় ভিজবো, অন্ধ হয়ে হাঁটব কেমন করে।"

বাসুদেব ঠাট্টা করে বলল, "হাত ধরুন।"

কোনো রকমে চোখ চেয়ে মণিমালা আবার পা বাড়াল।

ঝড় উঠবে বলেই মনে হচ্ছিল। আকাশের সবটাই কালো। কালোর তলায় কেমন ধূসর কুণ্ডলী পাকানো মেঘের রাশি ঢেউয়ের মতন ছড়িয়ে যাচ্ছে। রেল-লাইনের সাঁকোর দিকে গুমগুম শব্দ, গাড়ি চলে যাচ্ছে, ঝোড়ো হাওয়াও যেন উঠে আসছে জঙ্গলের দিক থেকে।

মণিমালা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি হাঁটবার চেষ্টা করছিল। চোখ করকর করছে। ধুলো রয়েছে চোখে।

বাসুদেব বলল, "বৃষ্টি এসে গেলে কিন্তু সামলাতে পারবেন না, দিদি!"

"না পারলাম। তা বলে ছুটব নাকি ?"

"ছুটুন না। কে দেখছে!" বাসুদেব ফাজলামি করে বলল, "আমি তো রয়েছি।"

"পড়ে গেলে ধরবে ?"

"তা ধরব।"

"তবে ধরো…", হাত বাড়িয়ে দিল মণিমালা।

বাসুদেব হাত ধরল মণিমালার। ছেলেমানুষের মতন কয়েক পা ছুটেও গেল মণিমালা। তারপর হেসে ফেলল। "আর কি বয়েস আছে

ছোটার? ছেলেবেলায় টপটপ করে ছোট ছোট পাহাড়গুলোয় চড়তাম। পাহাড় মানে পাথরের ঢিবিগুলোয়। মা আর মাসী আমাকে মদ্দা বলত।" হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চোখটা আবার সাবধানে রগড়ে নিল মণিমালা। তারপর হেসে ফেলে বলল, "দাদুর ঝাঁঝার বাড়িতে বড় বড় পেয়ারা গাছ ছিল। সেই গাছ থেকে পড়ে বাঁ হাতের কনুইয়ের তলার দিকটাও ভেঙেছি।"

"সাবাস!" বাসুদেব হেসে উঠল।

"সাবাস কেন! বিশ্বাস হচ্ছে না। বেশ, বাড়ি চলো, দেখাব। ভাল করে দেখলে এখনও ভাঙাটা বোঝা যায়।"

বাসুদেব হঠাৎ অসর্তক ভাবে বলল, "আপনাকে ভাল করে কি দেখব দিদি, মন্দ করেই দেখলাম না।"

মণিমালা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, "এ-কথা বললে কেন?"

বাসুদেব কথাটা বলে ফেলেছিল, হয়ত পরিহাস করেই; বলে ফেলে সামান্য অপ্রস্তুত বোধ করল। ইতস্তত করে বলল, "না, আপনাকে আমি আর কতটুকু দেখলাম, চিনলাম বলুন। তাই বলছি, দিদি।"

মণিমালা কেমন অসহিষ্ণু গলায় বলল, "তোমার ওই দিদি দিদি আর ভাল লাগে না শুনতে! মনে হয় ঠাট্টা করছ।"

বাসুদেব মণিমালার গলার স্বরে অবাক হল। খানিকটা যেন বিরক্ত, অসহিষ্ণু মণিমালা।

রেল ফটক পর্যন্ত পৌঁছোনো যাবে কিনা কে জানে। মেঠো রাস্তা শেষ করে এখন তারা কাঁচা রাস্তায়। গাছপালা মাথা ঝাপটাচ্ছে। পাতার শব্দ। ঝড় ছুটে এল; কালচে হয়ে রয়েছে চতুর্দিক, তার মধ্যে আঁধি উঠল।

এখন আর কিছু চোখে দেখা যায় না। শন শন করছে হাওয়া, ধুলোয় আর শুকনো পাতায় চারপাশ আচ্ছন্ন। বালির দানা এসে গালে মুখে লাগছে। হাওয়ার দাপটে শরীর বেটাল হয়ে যায়। মণিমালা বাসুদেবের হাতটা ধরে ফেলল।

এই অবস্থায় কথা বলা যায় না। পিঠ নুইয়ে, ধুলোর ঝড় থেকে মুখ বাঁচিয়ে দুজনে হাঁটতে লাগল। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি। মণি-মালা শাড়ি সামলাতে পারছে না আর, আঁচল উড়ে যাচ্ছে, পায়ের দিকের শাড়ি উড়ছে, জড়িয়ে যাচ্ছে; বাতাস যেন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে মণিমালাকে।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল।

বাসুদেব কোনো রকমে বলল, "রেল ফটক পর্যন্ত চলুন। ওখানে গুমটি আছে।"

মণিমালা অন্ধের মতন বাসুদেবের হাত ধরে বিপর্যস্ত ভাবে হাঁটছিল।

মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ি ফিরল মণিমালা। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।

রেল গুমটিতে দাঁড়াতে হয়েছিল কিছুক্ষণ। ঝড় কালকের মতন ভয়ংকর হল না। ধুলো বালি ছড়িয়ে গাছপালা কাঁপিয়ে উড়ে গেল। বৃষ্টি নামল বড় বড় ফোঁটায়। এক পশলা। ক্ষণস্থায়ী বৃষ্টির পর টিপ টিপ জল ঝরছিল। আকাশে মেঘ ডাকছে তখনও। মনে হচ্ছিল, বৃষ্টি আরও হবে।

ওই অবস্থায় বাড়ি ফিরল বাসুদেবরা, চোখমুখ ধুলোয় ভরা, মাথা গা কিচকিচ করছে, জামাকাপড় সামান্য ভিজে।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। ঝড়-বৃষ্টির দরুন রাত রাত মনে হচ্ছিল।

বাড়িতে ঢুকেই মণিমালা ছুটল চোখমুখ ধুয়ে শাড়ি জামা পাল্টাতে। বাসুদেব ঠাট্টা করে বলল, "আমি চাইছিলুম বৃষ্টিটা বেশ জোরে নামুক। চলুক ঘণ্টা খানেক।

"কেন?"

"বেড়ানোর শখ মিটত। ভিজে চুপচুপে হয়ে ফিরতেন।"

"আমি জব্দ হতুম এই তো! তুমি আমায় জব্দ করে মজা পাও, না?"

বাসুদেব হাসল।

বিছানায় বসে মণিমালা পর পর বার বার কয়েক হাঁচল। নাক টানল। চোখ ভিজে ভিজে। বলল, "কত ধুলো যে নাকে গিয়েছে।"

বাসুদেব তার চিরুনি দিয়ে মাথার ধুলো পরিষ্কার করছিল।

শাড়িজামা পাল্টানো হয়েছে মণিমালার। বাসুদেব হাত মুখ ধুয়ে মাথা মুছে পাজামা পরেছে। গায়ে গেঞ্জি।

জানলা খোলাই ছিল। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝিরে। বাদলা বাতাস। ভেজা-ভেজা গন্ধ উঠছিল।

চিরুনিটা হাতে নিয়েই বাসুদেব টিনের চেয়ারে বসল। বলল, "আমার চুলে সের পাঁচেক ধুলো ঢুকেছে।"

মণিমালা হাসির মুখ করল। "অত ঘন, কোঁকড়ানো চুল হলে তো ঢুকবেই। এসো, পরিষ্কার করে দি।"

কথাটা পরিহাস হিসেবেই ধরে নিয়ে বাসুদেব বলল, "পারবেন না। আমার চুলের জাত আলাদা, ছেলেবেলায় মা বলত, সাঁওতালদের ছেলের মতন।"

মণিমালা হাত বাড়াল। "এসো না, দেখি—পারি কি না।"

বাসুদেব মণিমালার চোখ-মুখের ভাবটা লক্ষ্য করে হঠাৎ কেমন লজ্জা পেল। বলল, "থাক। কাল মাথায় সাবান ঘষে নেব।"

"লজ্জা করছে ?"

"না, লজ্জার আর কি!" বলে বাসুদেব চিরুনিটা টেবিলের দিকে ছুঁড়ে দিল, যেন ব্যাপারটা মিটে গিয়েছে।

মণিমালা বোধ হয় মজা পাচ্ছিল। খানিকটা হেলে পড়ে, আধ শোয়া হয়ে, হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে চিরুনিটা তুলে নিল। সোজা হয়ে বসল। বলল, "এসো, সাঁওতালী চুলের বাহার দেখি।"

"ধ্যুত!"

"তাহলে আমিই উঠছি।" মণিমালা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

বাসুদেব অস্বস্তি বোধ করল। "আপনি যে কি করেন। ঠিক আছে···ধুলোফুলো আমাদের মাথায় হরদম বসছে, দিদি। ধুলো নিয়ে আমাদের কারবার।"

"আবার দিদি ?" মণিমালা ধমকের গলা করে বলল।

"দিদি নয় ? তবে কি!"

"দিদি। তবে মণিদি।" মণিমালা যেন বাসুদেবকে জ্বালাতন করার জন্যেই তার পাশে এসে চিরুনিটা মাথায় ঠেকিয়ে দিল।

বাসুদেব হাত ওঠাল, মাথা ঝাঁকাল।

মণিমালা হাসছিল। "কেন মিছেমিছি লড়াই করছ! এত লজ্জা ভাল নয়। আমি কি তোমার কাছে লজ্জা করলুম।"

বলার কিছু ছিল না। বাসুদেব হাত নামাল।

মণিমালা বাসুদেবের মাথাটা নিজের দিকে হেলিয়ে নিয়ে তার চুল আঁচড়ে দিতে দিতে বলল, "তখন তুমি কী বলছিলে যেন ?"

"কখন ?"

"রাস্তায়। বলছিলে না, আমার ভালমন্দ কতটুকুই বা দেখেছ! কী বা চিনেছ আমায় ?"

মনে পড়ল বাসুদেবের। মাথা নাড়ল। "হ্যাঁ, বলেছি।" বলে একটু থেমে আবার বলল, "আমি সত্যি সত্যি আপনাকে এক বিন্দুও চিনতে পারলাম না।"

মণিমালা রঙ্গ করেই বলল, "বাঃ! সাত আট দিনের বেশী তোমার বাড়িতে থাকলুম, তোমারই ঘর বিছানা দখল করে। হাত পুড়িয়ে খাওয়ালাম! কত গল্পসল্প হল। তবু বলছ চিনতে পারলে না।"

বাসুদেব অনুভব করছিল, মণিমালা খুব ধীরে ধীরে আলতো করে —অনেকটা যেন আরাম দেবার মতন করে তার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। কথার জবাব দেবার জন্যেই বাসুদেব হালকা গলায় বলল, "না, চিনতে পারি নি; তবে বুঝতে পেরেছি আপনি একেবারে হাতুড়ে নন, কাজকর্ম জানেন। অন্তত রান্নাবান্না।"

মণিমালা হাতের চিরুনি দিয়ে আলতো করে বাসুদেবের কাঁধে মারল। "তুমি বড় নেমকহারাম।"

চিরুনিটা রেখে দিল মণিমালা। বিছানায় গিয়ে বসল আবার। বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, মুখ ফিরিয়ে জানলার বাইরে বৃষ্টি আর অন্ধকার দেখল। তেঁতুলগাছের নীচেটা ঘুটঘুটে হয়ে রয়েছে।

মণিমালা মুখ না ফিরিয়েই বলল, "আমাকে আমি নিজেই কতটুকু চিনেছি বুঝতে পারি না। তোমায় আমি কী চেনাব।"

বাসুদেব শান্ত স্থির হয়ে বসে থাকল। দেখছিল মণিমালাকে। সামান্য আগে যে লঘু ভাব ছিল, সকৌতুকের ভঙ্গি—তার

ছায়ামাত্র আর নেই মণিমালার চোখেমুখে। গম্ভীর, অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল তাকে।

জানলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মণিমালা বলল, "তোমায় তখন ঝাঁঝার কথা বলছিলাম না? আমার ছেলেবেলার পাঁচ ছটা বছর ঝাঁঝায় কেটেছে। তুমি ডালটানগঞ্জের নাম শুনেছ তো! আমার বাবা ছিল ডাক্তার। বাবার স্বভাবটাই ছিল অদ্ভুত। ছেলেমানুষের মতন। হুজুগে ছিল। বড় বেপরোয়া। মা বলত, ছন্নছাড়া মানুষ। বাবার রোজগারপাতি ছিল না-ভাল না-মন্দ। সংসারে আমরা ছিলাম চারজন, মা-বাবা আর আমরা দুই বোন। বাবার যা আয় তাতে আমাদের যেত না। একে বেহিসেবী তার ওপর হুজুগে; মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন রাস্তা থেকে কবেকার কোন বন্ধু, কোন না কোন আত্মীয়, রাম-শ্যাম যাকে পারত বাড়িতে এনে তুলত। লোকগুলোও বড় অদ্ভুত ছিল, একবেলার নাম করে ঢুকে দিব্যি হপ্তা কাটিয়ে যেত," বলে মণিমালা ম্লান একটু হাসল, "অনেকটা আমার মতন। আমি যেমন তোমার কাছে এক রাত্তিরের আশ্রয় চেয়ে আট ন'দিন কাটিয়ে যাচ্ছি!"

বাসুদেব হাসির মুখ করল। বলল না কিছু। সিগারেটের প্যাকেটটা জামার পকেটে। ইচ্ছে করছিল সিগারেট খেতে।

মণিমালা বলল, "মা বাবার এই খেয়ালীপনা, ছন্নছাড়া ভাব পছন্দ করত না। দুজনে মাঝে মাঝেই টাকা পয়সা, সংসারের এটা নেই, সেটা নেই, বাইরের লোকের উৎপাত—এই সব নিয়ে ঝগড়া বাধত। আমরা ঠিক জানি না, মায়ের ওপর রাগ করেই কি না, বা ধরো টাকা-পয়সার টানাটানির জন্যে—বাবা তলায় তলায় ব্যবস্থা করে যুদ্ধে চলে গেল। আমার বয়েস তখন চার কি পাঁচ, আমার

ছোট বোনের বছর তিন। বাবা যুদ্ধে যাবার পর আমরা এলাম ঝাঁঝায়, দাতুর বাড়িতে, মায়ের বাবা আর কি!"

বাসুদেব চেয়ার ছেড়ে উঠে জামার পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে নিল। জানলাটা দেখল একবার। জলের শব্দ সামান্য জোর হয়েছে।

"ঝাঁঝায় আমরা অনেক দিন ছিলাম। না থেকে যাব কোথায়? ঝাঁঝার বাড়িতে কত লোক তখন, সবাই বোমা-টোমার ভয়ে পালিয়ে এসেছে। শোওয়া-বসার জায়গা পাওয়া যেত না। বাবা যুদ্ধে যাওয়ায় দাতুও খুব চটে গিয়েছিল। পরে আর চটাচটি করত না। মা কাঁদত, ছটফট করত, মাঝে মাঝে ফিট হয়ে যেত। শেষে সব সয়ে গেল। চিঠি আসত বাবার, টাকা-পয়সাও। টাকাপত্তর আসতে থাকায় মায়ের খানিকটা লজ্জা কাটল, দাতুর ওপর ভর করে কত দিন আর কাটাবে। সংসারের এই এক মজা। টাকা পয়সা অনেক ভয়-ভাবনাকে হালকা করে দেয়, তাই না? আমার মা তার স্বামীর কী হবে সেই তুশ্চিন্তায় যত না মরেছে তার চেয়েও বেশী লজ্জা পেয়েছে মেয়েদের নিয়ে বাবার গলগ্রহ হয়ে থাকতে!"

সিগারেট ধরিয়ে বাসুদেব ধীরে ধীরে টানছিল। মণিমালা যা বলল, তাই কি? টাকা পয়সা কি ভয়-ভাবনা ভুলিয়ে দেয়?

মুখের কাছে হাত আড়াল করে মণিমালা বার কয়েক কাশল। "আমার মায়ের কিন্তু কোনো দোষ আমি ধরছি না। যার মাথায় নাবালক ছেলেপুলে মানুষ করার দায় পড়েছে সে কার কাছে হাত পাতবে, বলো! দাতু এককালে ভালই করেছিল রোজগারপাতি, বুড়ো বয়েসে তাই শেষমেষ ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছে, দাতু বেচারীর ঘাড়ে এত ভার চাপাতে মার ভাল লাগবে কেন! তা আমরা ঝাঁঝাতেই পড়ে

থাকলাম অনেক দিন। অন্যরা একে একে চলে যাচ্ছিল। ঝাঁঝার বাড়ি ফাঁকাও হয়ে এল। শেষে বাবা একদিন ফিরে এল। বাবাকে চেনাই যায় না। একমুখ দাড়ি মস্ত গোঁফ, গায়ের চামড়া কালো হয়ে গিয়েছে, মাথার চুল পাতলা। মাসখানেক ঝাঁঝায় থেকে বাবা আবার চলে গেল। মায়ের সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছিল কে জানে—তবে শুনলাম আমরা আর ক'মাস পরে বাবার কাছে চলে যাব। মাস ছয় পরে আমরা সত্যি সত্যিই, বাবার কাছে চলে গেলাম। বাবা তখন চন্দননগরে। কেন যে চন্দননগরে গিয়ে বসল বাবা তা জানি না, তবে ওখানেই নাকি আদি বাড়ি ছিল বাবার। যুদ্ধের চাকরিতে আর নেই বাবা। নিজের ডিসপেনসারী খুলেছে, বাড়ি-ঘর ভাড়া নিয়েছে। নতুন করে সংসার পাতল মা। আমাদের এক ভাই হল চন্দননগরে। আমার তখন বছর নয় বয়েস হবে, দশও হতে পারে।” মণিমালা চুপ করে গেল আবার, অন্যমনস্ক হয়ে গেল, যেন দূরের কিছু দেখছিল, কিছুক্ষণ পরে নিঃশ্বাস ফেলল বড় করে, মৃদু হাসি এল মুখে, বলল, “আমার সেই ভাইকে আমরা আদর করে বলতুম পাউরুটি, ফোলা-ফোলা তুলতুলে নরম—ঝাঁঝার মকসুদের টাটকা পাউরুটি যেন। সেই ভাই মাস চারেক বেঁচে ছিল।”

বাসুদেব জিবে শব্দ করল। সিগারেটটা শেষ হয়ে গেছে। দরজা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল। বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে না। বাদলা বাতাস আসছে এলোমেলো ভাবে।

“আপনি তাহলে চন্দননগরের মেয়ে। আমার মামার বাড়িও চন্দননগরে ছিল, বাসুদেব বলল।”

“গিয়েছ কখনও ?”

"এক আধবার ছেলেবেলায়। একই মামা ছিল। মারা যাবার পর আর যাই নি। মামী কাশী চলে গিয়েছিল। মামার ছেলেমেয়ে ছিল না।"

মণিমালা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, "চন্দননগরে আমরা অনেক দিন ছিলাম। সুখেদুঃখে যেমন থাকে মানুষ। কত কি ঘটে গেল ওখানে আমাদের। বাবা ভাল পশার করে ফেলল, টাকা পয়সার মুখ দেখল মা। সোনাদানা গড়াতে লাগল। বার দুই আত্ম-হত্যা করতেও গিয়েছিল..."

"আত্মহত্যা—"

"একবার গিয়েছিল গঙ্গায় ডুবে মরতে, নৌকোর মাঝি-মল্লারা দেখতে পেয়ে যায়। আর-একবার বাবার ওষুধের ব্যাগ থেকে চুরি করে কিসের একটা ওষুধ খেয়েছিল--" মণিমালা কেমন নিস্পৃহ, নিরাসক্ত গলায় বলল। মনে হতে পারে, তার মার আত্মহত্যার চেষ্টাকে সে ঠাট্টা করছে।

বাসুদেব বলল, "আত্মহত্যা কেন? কী হয়েছিল?"

মণিমালা ছাদের দিকে মুখ তুলে বলল, "আমারই মা তো! মাথার গোলমাল ছিল।"

কথাটা যে মণিমালা এড়িয়ে গেল বুঝতে পারল বাসুদেব। স্বামী-স্ত্রীর অ-বনিবনা? ঝগড়া-ঝাটি? সাংসারিক অশান্তি?

নিজের থেকেই মণিমালা বলল, "একবার ভাইটার শোকে, আর-একবার বাবার ওপর রাগ করে। আমার মা শেষ পর্যন্ত কিন্তু মারা গেল। তখন আমার বয়েস বছর কুড়ি। বিয়ের পাত্র ঠিক হয়ে গেছে প্রায়। হুট করে মা মারা গেল। বিয়েটা বন্ধ হয়ে গেল!"

"কী হয়েছিল মায়ের?"

"মেয়েদের নাড়ির অসুখ—, তুমি বুঝবে না। বাবা অনেক চেষ্টা করেছিল। পারে নি বাঁচাতে।"

বাসুদেব মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল। বৃষ্টি নেমেছে। হালকা শব্দ হচ্ছিল।

"বিয়ে কোথায় হল আপনার?" মুখ ফিরিয়ে বাসুদেব তাকাল মণিমালার দিকে।

"অনেক পরে হল। কলকাতায়। টালার দিকে। বিয়ের পর আমি রাজরানী হলাম। আমার স্বামীর এখন অনেক দৌলত। তেতলা বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা কত কি!"

বাসুদেব রূপকথা শুনছে যেন, হেসে বলল, "আপনি তো বিরাট বড়-লোক, দিদি।"

"খু-ব! কিন্তু আবার দিদি কেন?"

"মণিদি?" বাসুদেব হাসল।

মাথা নাড়ল মণিমালা। "হ্যাঁ।" একটু থেমে কেমন যেন হাসির চোখ করে বলল, "এবার আমায় চিনতে পারলে?"

মাথা নাড়ল বাসুদেব, "না।"

আচমকা তোড় এল বৃষ্টির। হাওয়ার দমকাও। উঠোনে শব্দ হচ্ছিল। বারান্দার চাল গড়িয়ে জল পড়ছে ছড়ছড় করে।

জল আসছে জানলা দিয়ে। বাসুদেব চেয়ার ছেড়ে উঠে টেবিলের দিকের জানলাটা বন্ধ করতে করতে মণিমালাকে বলল, "আপনার বিছানা ভিজে যাবে।"

মণিমালা পেছন ফিরে পাশের দিকে ঝুঁকে ছোট জানলাটার গায়ে হাত বাড়াল। ছাঁট আসছে জলের।

বিছানায় আরও একটু উঠতে হল, প্রায় উপুড় হয়ে শুয়ে হাত

বাড়িয়ে জানলার পাল্লা টানল মণিমালা। বন্ধ করল।

বাসুদেব টেবিলের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। এই আচমকা জোর বৃষ্টি আসার আগে থেকেই যে জানলা দিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি জল আসছিল কেউ দেখে নি। টেবিলের ওপর রাখা টুকিটাকি সামান্য ভিজেছে, টেবিল বাতিটা একটু সরিয়ে রাখল বাসুদেব। চিমনিতে জল লাগালে ফেটে যেত।

মণিমালা সোজা হয়ে বসল। তাকাল। বাসুদেব তাকে দেখছে। চোখে চোখে ক'মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর বলল, "আর তাহলে তোমায় কী বলি বলো তো।"

টেবিলের সামনে থেকে সরে আসছিল বাসুদেব। মণিমালা যা বলেছে সবই ওপর ওপর, ভেতরের কথা কিছু বলে নি। কেন সে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে? অমলেশ কে? কেন হঠাৎ এসে বাসুদেবকে এত মায়া-মমতা স্নেহ দিয়ে অভিভূত করে গেল?

চেয়ারে বসল না বাসুদেব। অন্যমনস্কভাবেই আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বৃষ্টি আর অন্ধকার উঠোন জুড়ে রেখেছে।

মণিমালাও অনেকক্ষণ কথা বলল না। তারপর আচমকা ডাকল, "শোনো।"

ঘাড় ফেরাল বাসুদেব।

চোখের ইশারায়, ঘাড় নুইয়ে মণিমালা ডাকল বাসুদেবকে। "এখানে এসো।"

বাসুদেব একটু দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর কাছে গেল মণিমালার।

হাত ধরল মণিমালা বাসুদেবের। "বসো।"

বাসুদেবকে টানল মণিমালা। বসল বাসুদেব।

মণিমালা বলল, "তুমি খুশী হলে না? ভাবছ, আর কী আছে যা আমি বলছি না!···আর যা আছে—তোমায় আমি কেমন করে বোঝাব!···বেশ, তাও তোমায় শুনিয়ে রাখি।"

এগার

মণিমালা কিছুক্ষণ উদাস, বিষণ্ণ হয়ে কেমন এক ঘোরের মধ্যে বসে থাকল। বাসুদেবের হাত তার মুঠোয়। চাপ পাচ্ছিল বাসুদেব।

মণিমালা বলল, "আমার ছেলেবেলাটা কেটেছে একরকম, খানিকটা বয়েস হলে আবার অন্যরকম। বলত কি আমাদের বাড়িটাই ছিল অদ্ভুত। বাবার সেই স্বভাব—খেয়ালীপনা, বাড়িতে হাট বসিয়ে রাখা, হুস করে দু-চার দিনের জন্যে কোথাও উধাও হয়ে যাওয়া—এর কোনোটাই ঘোচে নি। আর আমার মা একদিকে তিতিবিরক্ত হয়েছে স্বামীর ওপর, নিত্য ঝগড়া করেছে—আবার অন্যদিকে আঁকড়ে থেকেছে বাবাকে। মা ছিল বড় অভিমানী। মার যত অভিমান বাবার ওপর, যত আক্রোশ; আমার বাবা যে আজ কুম্ভমেলায়, কাল সাগরমেলায় পরশু কোথায় মড়ক লেগেছে—সেখানে ছুটছে তাতে মার ষোলো আনা অহঙ্কার ছিল। দু'জনের স্বভাবে কোথাও এতটুকু মিল ছিল না বাইরে, কিন্তু ভেতরে কী ছিল তারাই জানে। আমাদের দুই বোনের ওপর নজর ছিল মার। আর বাবা আমার ছোট বোনকেই একটু বেশী প্রশ্রয় দিত। আমার মার শাসন ছিল কড়া। স্কুলে পাঠিয়েই মা নিশ্চিন্ত ছিল না, বলত—মেয়ে হয়ে জন্মেছি যখন তখন কোথায় কোন সংসারে গিয়ে পড়তে হবে—

কেউ কি বলতে পারে। সংসারের কাজকর্মও শেখাত মা। বাবাই বরং আপত্তি করত। এইভাবে বড় হয়ে উঠলাম। মার ইচ্ছে ছিল, আমার তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়। ছেলের খোঁজ চলতে লাগল। আমার বরাতে মার পছন্দমতন ছেলে আর জোটে না। শেষে যা জুটল তাও বরাতে পেলাম না। মা মারা গেল।”

মণিমালা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। থামল কিছুক্ষণ। হাত ছেড়ে দিয়েছিল বাসুদেবের। বড় বড় শ্বাস নিল। তারপর বলল, “মা মারা যাবার পর আমাদের সংসার কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। বাইরে থেকে বাবাকে দেখে অতটা বোঝা যেত না, ভেতরে বাবা বেশ ভেঙে পড়েছিল। আমাকে ছাড়তেও পারত না, অথচ বুঝত, বিয়ে না দিয়েও উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত আমার যখন বিয়ে হল তখন বয়েস বেড়ে পঁচিশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।”

দমকা বৃষ্টি থেমেছে, বাইরে আর শব্দ নেই, উঠোনে অবশ্য রয়েছে। জানলা খোলার কোনো দরকার ছিল না। ঘর ঠাণ্ডা। আবার কখন তেড়ে বৃষ্টি আসবে কে জানে।

মণিমালা বলল, “স্বামীর ঘর করতে এলাম কলকাতায়, টালার দিকে। সেকেলে বাড়ি, একসময় পয়সাকড়ি যে ছিল ঘরবাড়ি আসবাবপত্র দেখেই বোঝা যায় খানিকটা। বাড়ির বারো আনা গেছে, চার আনা টিকে ছিল। বাইরের মহলে ভাঙাচোরা আসবাব, কতক পেল্লায় পেল্লায় ছবি, ভাঙা কাচ—বাহারী শার্সি জমে থাকত, ধুলোয় দমবন্ধ হয়ে আসে ঘরে ঢুকলে ঃ অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। অন্দরমহলে মানুষ বলতে আমার স্বামী, স্বামীর এক সম্পর্কের পিসী, আর আমি। বাবা আমায় এমন জায়গায় বিয়ে দিয়েছিল যেখানে আমি নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারি। অন্দরমহলের একদিকে থাকতাম

আমরা, অন্যদিকে আমার পিসী-শাশুড়ী। ঝি-চাকর থাকত নীচের তলায়। বাড়িটা যে খুব বড় ছিল তা নয়, তবু মিলিয়ে-জুলিয়ে দশ বারোটা ঘর। ব্যবহার করার মতন গোটা পাঁচ। আমার তো সব কেমন স্যাঁতসেঁতে, নোনা-ধরা লাগত।”

মণিমালার কাশি এসেছিল। গলা জড়িয়ে গেল। কাশল, গলা পরিষ্কার করল। “আমায় একটু জল খাওয়াবে?”

উঠল বাসুদেব। বাইরে গেল জল আনতে।

বৃষ্টি এখনকার মতন থেমে আছে। আকাশের চেহারা ভাল নয়।

জল এনে দিল বাসুদেব। মণিমালা জল খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল। “বসো।” নিজের পাশেই আবার বসিয়ে নিল বাসুদেবকে।

“আমার স্বামীর নাম সত্যপ্রিয়”, মণিমালার ঠোঁটের আগায় হাসির ভাব উঠল, “বিয়ের আগে শুনেছিলাম, ওকালতি পাশ করেছে। ছোট মাপের উকিল। বিয়ের পর দেখলাম, ওকালতির কালো কোট গায়ে চাপায় না, আইন আদালত করতে ছোটে না, চাকরি করে কোন বড় কোম্পানীতে। বলত ল' ডিপার্টমেণ্ট। শান্ত, শিষ্ট মানুষ, চেহারাটিও ভাল, স্বভাব বড় ঠাণ্ডা। নেশাটেশার বালাই নেই, ওই চা ছাড়া, কখনও সখনও এক-আধটা পান সিগারেট খায়। ···এমন স্বামী কোন মেয়ের না পছন্দ হয় বলো! আমারও খুব পছন্দ হয়েছিল। আর পাঁচটা মেয়ের মতন আমি স্বামীর সুখ-আরামের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমার পিসী-শাশুড়ী অনেকদিন ধরে স্বামীর ওপর কর্তৃত্ব করত বলে তাঁর একটু গায়ে লেগেছিল, তবে সেটা তিনি সয়ে নিয়েছিলেন পরে।” মণিমালা অল্পক্ষণের জন্যে থামল। তারপর বলল, “আমার স্বামীর বাড়িতে আগে থেকেই একজনের আসা-যাওয়া ছিল, তার নাম অমলেশ। সে সম্পর্কে আমার স্বামীর

কেমন যেন মাসতুতো ভাই হত, বয়েসে মাসখানেকের ছোট বড়, দু'জনে ছিল বন্ধু। আমার বিয়ের সময় অমলেশকে দেখি নি। সে নাকি এলাহাবাদে গিয়ে আটকে পড়েছিল। ফুলশয্যার দিন দুপুরে এসে হাজির। আমায় দেখে বলল, 'আরে এ তো আমার দেখা মেয়ে। চিনি একে।...' আমি কোনোকালেই দেখি নি অমলেশকে, চেনা হলাম কেমন করে কে জানে! নতুন বউ, কিছু বলতেও পারলাম না। পরে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেমন করে চিনলেন?' জবাবে হেসে বলল, 'চিনি', বলে ঠাট্টা করে গান ধরল, 'চিনি গো চিনি তোমারে...।' আমার স্বামীকে বললাম, 'ও আমায় চিনি চিনি বলে কেন? কোথায় চিনল?' স্বামী বলল, 'ঠাট্টা করে। বড় ফাজিল। তোমায় খেপায়। মণ্টু খুব ভাল। মাথায় একটু ছিট আছে।'

"অমলেশের ডাক নাম ছিল মণ্টু। আমার বিয়ের পর মাস-খানেক অমলেশ টালার বাড়িতেই থেকে গেল। 'আপনি'র সম্পর্কটা ক'দিনেই 'তুমি'-তে নামল। এক একজন মানুষ থাকে তারা যতক্ষণ কাছে থাকে তোমায় কিছু ভাবতে দেয় না, বলতে দেয় না—। অমলেশ ছিল তাই। অফুরন্ত তার বকবকানি। তাকে পছন্দ না করে থাকা যায় না।

"অমলেশদের বাড়ি ছিল পাকুড়ের দিকে। ব্যবসা ছিল পৈতৃক। ও যে কী ব্যবসা করত আমি বুঝতাম না। ব্যবসা করার পাত্র ওকে মনে হত না। কলকাতায় টালার বাড়িতে এলে ছোটাছুটি করতে দেখতাম। ওর বাবা নেই, মা তখনও বেঁচে। মায়ের নানা রোগ।

"স্বামীর সঙ্গে এক আধ বছর আমার ভালই কেটেছিল। পিসী-শাশুড়ী মারা গেলেন। এদিকে আমার বাবার শরীর ভেঙে পড়েছিল। আমার ছোট বোনের বিয়ের জন্যে বাবা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মায়া

—আমার ছোট বোন তো আমার চেয়ে মাত্র দেড় দু বছরের ছোট। ...বাবার জন্যে আমার বড় মন কেমন করত। ছোট বোনকে নিজের কাছে এনে রাখতে পারতাম না, কে দেখবে বাবাকে।

"একদিন কি খেয়াল হল, অমলেশ তখন আমাদের কাছে রয়েছে। তাকে বললুম, 'এই, তুমি আইবুড়ো হয়ে কতদিন গায়ে হাওয়া দিয়ে ঘুরে বেড়াবে! বিয়ের বয়েস পার হয়ে যাচ্ছে। আমার ছোট বোনকে বিয়ে করো, তোমারও গতি হয়, আমিও বাঁচি।'... ঠাট্টা তামাশা করে কথাটা বলি নি আমি, ভেবে-চিন্তেই বলেছিলাম। জবাবে অমলেশ কি বলল জানো? বলল, 'বিয়ে আমি করব না। আইবুড়োই থাকব। তোমাকে হলে অবশ্য করতাম। তোমার বোনকে নয়।' ...ওর কথা শুনে ভাবলাম, ঠাট্টা করছে, হতচ্ছাড়া একেবারে, হাত বাড়িয়ে ঠাট্টা করেই পিঠে মারতে গেলাম; ও আমার হাত ধরে ফেলে বলল, 'সত আমার ভাই, বন্ধু। তবু বলব, তুমি ভুল মানুষকে বিয়ে করেছ। অবশ্য না জেনেই। তোমার কপাল!'

"ভুল মানুষ! কিসের ভুল? আমি শান্ত, শিষ্ট, দেখতে মোটামুটি ভাল একজনকে বিয়ে করেছি, এর মধ্যে ভুল কী? তা ছাড়া, বিয়ে তো নিজের পছন্দে করি নি। তা হলে ভুল কিসের?"

"অমলেশ আমায় আর কিছু বলল না। মনে আমার খটকা লেগে থাকল। নানা দিক থেকে খুঁটিয়ে দেখেও কিছু বুঝতে পারলাম না। শুধু এইমাত্র বুঝলাম, আমার স্বামী বড় ঠাণ্ডা। তার কোনো তাপ-উত্তাপ, আবেগ নেই। আহ্লাদ, হইচই নেই। চাকরি করে, আইনের বইপত্র ঘাঁটে, অফিসের কাগজে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকে, আর মাঝে মাঝে ভবানীপুর, বেহালা, এখান সেখান সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করতে

যায়। আমার নিজের এই জিনিসটা পছন্দ হত না। কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীর বাতিক তো থাকে অনেকের, নিষেধ করেছি; কান দেয় নি। বাতিক যখন সাধু-সন্ন্যাসীর, বার বার বলে লাভ কি! তা ছাড়া কেউ যদি ফোঁটা তেলক পছন্দ করে তাকে বাধা'ই বা দেব কেন?

"অমলেশ আবার যখন এল, তাকে আমি ধরে পড়লুম, তাকে বলতেই হবে কোথায় আমার ভুল হয়েছে। অমলেশ বলল না, বলবে না সে, যা বোঝার আমাকে বুঝে নিতে হবে।

"মনে অশান্তি থাকল। বাইরে কিছু বোঝার উপায় নেই। ছোট বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছিল বাবা। আমার যাওয়া দরকার। বাবার কাছে গিয়ে আমার থাকা হত না, এ-বেলা গিয়ে ও-বেলা আসা। অনেক দিন পরে যাওয়া, বোনের বিয়ে, মনের অশান্তিটা চাপাই থাকল। স্বামীকে দেখাশোনার জন্যে থাকল ঝি-চাকর।"

"সপ্তাহ তিন পরে স্বামীর বাড়িতে ফিরে এসেই যেতে হল হাসপাতালে। বাচ্চাটা পেটেই নষ্ট হয়ে গেল।"

"আমার স্বামীর ধর্মকর্মে মতি দিনে দিনে বাড়ছিল। একদিন দেখি নীচের ঘরদোর পরিষ্কার হচ্ছে, মিস্ত্রীমজুর এসেছে। স্বামী বলল, মহেশ্বর মহারাজ আসবেন।"

"কে মহেশ্বর মহারাজ বুঝলাম না। স্বামীর নানান জায়গায় যাতায়াত ছিল। অমলেশ এসেছিল। তাকে বললাম, কে মহেশ্বর মহারাজ জানো তুমি? অমলেশ বলল, না—আমি রাজা মহারাজার কাছে ঘুরি না। তুমি সত্যকে জিজ্ঞেস করো না কেন!"

"বেশীদিন বসে থাকতে হল না। আমার স্বামীর মহেশ্বর মহারাজ এলেন, ভেবেছিলাম মহারাজ যখন তখন তাঁর পোশাক-আশাক হবে গেরুয়া। দেখলাম, তা নয়। ধুতি, পাঞ্জাবি, চাদর পরা মহারাজ।

মহারাজের সঙ্গে তাঁর মেয়ে। নিজের নয়, শুনলাম পালন করেছেন। বয়েসে আমার সমান সমানই হবে। মোটাসোটা গোলগাল গড়ন, ধবধবে রঙ গায়ের; একটা চোখ ভীষণ টেরা। সধবার বেশ পরে থাকত। মাথায় সিঁদুর দিত চওড়া করে, চুল রাখত এলিয়ে। স্বামী নাকি ময়মনসিংহে। কাজেকর্মে জড়িয়ে আসতে পারছে না। মহারাজ যিনি তাঁর আচার-আচরণ গৃহীর মতনই ছিল। দেখতে মন্দ নয়। বয়েস বছর পঞ্চাশ হবে। চশমা পরতেন সোনালী ফ্রেমের। শুনলাম, পুরীতে তাঁর আশ্রম।

"আমার এ-সব পছন্দ হয় নি। বাড়ির মধ্যে এই উৎপাত কেন? আমার স্বামী চাইত, তাঁর অমন ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্রকে আমি যেন ভয়-ভক্তি করি। ভয় আমার হত, শুনতাম, মহারাজের নানা দৈব-ক্ষমতা। ভক্তি হত না। মহারাজের খাওয়া-দাওয়া শোয়ার কোনো কষ্ট সহ্যের ব্যাপার ছিল না। কিন্তু ভড়ং ছিল। তাঁর মেয়েরও তাই। মেয়েটাকেই আরও সহ্য হত না। তার ভাব-ভঙ্গি খারাপ লাগত চোখে। আমাকেও সে দেখতে পারত না। কতবার যে অপদস্থ করেছে। মহারাজের মেয়ে বলে আমার স্বামী তার খুব বাধ্য ছিল।

"তিন-চারটে মাস ওরা আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেল। কিছুতেই আর ওঠে না। রোজ সকাল-সন্ধ্যে মহারাজের ভক্তের দল জোটে। মহারাজ প্রণাম আর প্রণামী নেন। তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে উপদেশ দেন ভক্তদের। শনি রবি হলে কথাই নেই। রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত ধর্মের কথাবার্তা চলে। আসলে সবাই আসে মহাপুরুষের দয়া-দাক্ষিণ্যে যদি কিছু পাওয়া যায়···। মানুষের দুঃখ শোক উৎকণ্ঠা বলেও কত কিছু থাকে। সান্ত্বনা পেতেও আসত লোকে।"

"মাস চার পরে বিদায় নিলেন মহেশ্বর। স্বামীকে মন্ত্র দিয়ে গেলেন। গুরুভক্তি দেখলাম আমার স্বামীর। গুরুঅন্ত প্রাণ হল। সকাল বিকেল ঠাকুর ঘরে ঢুকে গুরুকে ধ্যান করে। আমার সঙ্গে মনোমালিন্য। প্রয়োজন ছাড়া কথাবার্তাও বলে না।"

"অমলেশকে বললাম, একটা উপায় করো, এ তো আর পারি না। অমলেশ বলল, তুমি কিছুদিন তোমার বাবার কাছে গিয়ে থাকো। তাঁরও তো বলছ শরীর খারাপ। তুমি যাও, আমি এ-দিকটা দেখি—কী করতে পারি। তোমায় গিয়ে খবরাখবর দিয়ে আসব। মাসখানেক আমি আছি এখানে।

"বাবার কাছে চলে গেলাম আমি। শরীর একেবারে ভেঙে গেছে বাবার। মনে হচ্ছিল, বাবা আর বেশীদিন নয়।...অমলেশ চন্দননগরের বাড়িতে আসতে শুরু করল। ওই একদিন বলল, 'সত্য পুরী গিয়েছে, জান তুমি?'...আমি জানতাম না। বললাম, 'পুরী কেন? মহারাজের কাছে?'...অমলেশ বলল, 'মহারাজ নিমিত্ত', বলে কথাটা আর শেষ করল না। আমি চমকে উঠলাম না, অগাধ জলেও পড়লাম না। বুঝতে আমার কষ্ট হয় নি।...অমলেশকে সেদিন বলেছিলাম, 'তুমি আমায় এবার কি করতে বলো!' মাথা চুলকে অমলেশ বলল, 'আমি অনেক ভেবেও কিছু ঠিক করতে পারি নি, মণি। তুমি সত্যর বউ। নয়ত বলতাম, আমার সঙ্গে চলো। বিয়ে ভেঙে দাও। তোমায় আমি কী বলব! সহ্য করো, দেখো কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! এমনও হতে পারে, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"স্বামীর বাড়িতে ফিরে এলাম। মন কষাকষি বাড়ল। তখন আমার শরীর মন কোনোটাই ভাল যাচ্ছিল না। আবার একদিন

মর-মর অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল আমাকে। পেটের বাচ্চা নষ্ট হল আবার। স্বামী বলল, এ নাকি তার জানাই ছিল। তার গুরু তাকে বলে দিয়েছে, আমার সন্তান কোনোদিনই পূর্ণ অবয়ব হবে না।"

"শুনে আমার গা রি রি করে উঠেছিল। ঘেন্না ধরে গিয়েছিল স্বামী আর তার গুরুর ওপর। বলেছিলাম, তোমার বউয়ের পেটের খবর তোমার গুরু জানবে! ছিছি! স্বামী বলল, তার গুরু সর্বজ্ঞ।

"দ্বিতীয় বারের পর আমার শরীর বড় ভেঙে পড়েছিল। বয়েসও তো হচ্ছিল। অমলেশ বলেছিল, কোথাও গিয়ে মাস দুই জল-বাতাস বদলে আসতে। আমার স্বামী বলল, 'তুই ওকে পাকুড়ে নিয়ে যা— জায়গাও বদলানো হবে, তুইও দেখাশোনা করতে পারবি।'

"অমলেশ আমায় পাকুড়ে নিয়ে এল। মাস তিন ছিলাম তার কাছে। সে আমায় সেবাযত্ন করেছে, অভাব রাখে নি কিছুর।··· হ্যাঁ, ও আমায় ভালবেসেছিল। আমিও তাকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় নি। ও আমায় আবার কলকাতায় স্বামীর কাছে ফেরত দিয়ে গেল। দুই ভাইয়ের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিল আমি জানি না। যাবার সময় অমলেশ আমায় বলল, 'মাথা গরম করে কিছু করো না, মণি। জীবনে অনেক কিছু গোলমাল হয়ে যায়। দুর্ভাগ্য। আবার সময়ে অনেকটা সহ্যও হয়ে যায়, শুধরেও যায় হয়ত। সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। সহ্য করার চেষ্টা করো।'

"সেই যে চলে গেল অমলেশ আর এল না। পাকুড়ের ঠিকানায় চিঠি দিলে প্রথম দিকে দু-চার বার জবাব এসেছে। তারপর আর আসত না। স্বামী ওর নাম করতে চাইত না।···দিন কারও জন্যে বসে থাকে না। হু-হু করে মাস বছর গড়াতে লাগল। আমার স্বামী

চাকরি-বাকরি ছেড়ে ব্যবসা নিয়ে পড়ল। নীচের ঘরগুলো হল গুদোমখানা। তার গুরু মাথায় হাত রেখেছে। বলেছে, অর্থ সম্মান প্রতিপত্তি সবই হবে। শুধু একটা জিনিস হবে না, নিজের সন্তান। তাতে আর দুঃখ কি! পরকে আপন করে নেওয়াই তো আসল ধর্ম।

"আমার স্বামী সেই ধর্ম পালন করেছে। মেয়ে নিয়েছে, পালিতা। তার গুরুই দিয়েছে। গুরুদেবের নিজের একজন ছিল তো! আমি জানি, ও মেয়ে কে! সেই মেয়ের বয়েস এখন দশ। বাড়িতে তাকে রাখে নি আমার স্বামী। হোস্টেলে রেখে দিয়েছে। বাইরে। ছুটিটুটির সময় আসে ক'দিন। পুরীতেও যায়। আমায় সইতে পারে না। আমিও পারি না।"

"আমার স্বামী এখন ব্যস্ত মানুষ। বড়সড় ব্যবসা তার। টাকার অভাব নেই। পুরোনো বাড়ি ভেঙেচুরে সারিয়ে নতুন করে তৈরি করিয়ে নিয়েছে। তার এখন অনেক প্রতিপত্তি। পাড়ার ছোট-বড় তার গায়ে পিঁপড়ের মতন লেগে থাকে। ওই বাড়ির একপাশে আমি ঠাঁট নিয়ে পড়ে আছি। আমার নিজের ঝি-দাসী আয়াস আরামের সব ব্যবস্থা আছে।"

"এই আমার জীবন। বাইরে থেকে যদি দেখো কত কি আছে! স্বামী, আভিজাত্য, আথিক সুখ, ঘর-বাড়ি। এমন কি সামাজিক ভাবে একটা মেয়েও। ভেতরে কী আছে বলো! সবই ফাঁকা। কোনোটাই আমার নিজের নয়। অধিকার না থাকলে মানুষ বাঁচে না। আমার দাবী করার অধিকারটুকুও চলে গেছে।

"কত কাল এই ভাবে রয়েছি। আর পারি না। এক একসময় মনে হয়, বিষ খেয়ে মরি। তবু মরতে পারি না। কেন পারি না বলো

তো! কিসের মোহে বেঁচে আছি! আমার চারপাশে নিজের বলতে কেউ নেই। বাবা মারা গিয়েছে কবে, ছোট বোনের কোলে মাথা রেখেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। সেই বোন এখন মোগলসরাইয়ে থাকে, তার স্বামী চাকরি করে মোগলসরাইয়ে। সাধারণ চাকরি। দু-তিনটে কাচ্চাবাচ্চা। টেনেটুনে সংসার চালায়। ঝালাপালা হয়। তবু সে সুখী। তার বেঁচে থাকার অর্থ আছে। আর আমার কী আছে বলো?"

আমি কোনোদিন এ-সব কিছু চাই নি। সাদামাটা সংসার—আর পাঁচজনের মতন সাধারণ সুখ-দুঃখ—এই তো চেয়েছি। কী পেয়েছি তুমি বলো—"

মণিমালা বাসুদেবের দু হাত আঁকড়ে নিজের বুকে চেপে ধরল। অস্থির, কেমন যেন ক্ষিপ্ত চোখ, যেন বাসুদেবই কোনো দোষে দোষী। ঠোঁট শক্ত, নীল হয়ে আসছিল। বুক কাঁপছিল মণিমালার। ভেতরের শব্দটা এত দ্রুত এবং প্রবল যে সেই শব্দ আঘাত করছিল বাসুদেবের করতল। অদ্ভুত আঘাত বাসুদেবকে ভীত করছিল। অথচ সে এমন এক উষ্ণতা, কোমলতা অনুভব করছিল যা আগে করে নি।

মণিমালা এক ঘোরের মধ্যে বসে থাকল। ক্রমশই কেমন কাতর বিষণ্ন হয়ে আসছিল তার দৃষ্টি। চোখে কেমন ঝাপসা ভাব এল বাসুদেবের। মণিমালার নিঃশ্বাসের গন্ধ তার নাকে আসছিল যেন। জ্বরের মতন লাগছিল তার। বুক কাঁপছিল।

মণিমালা আচমকা হাত ছেড়ে দিল বাসুদেবের। বলল, "ইস্—আমি যে ঘেমে মরছি। তুমিও।"

বাসুদেব যেন কোনো স্বপ্নের মধ্যে ঘুম ভেঙে উঠে বসার মতন চমকে গিয়ে তাকাল। মণিমালা তার সামনে আর বসে নেই, উঠে

দাঁড়িয়ে আছে। ম্লান, বিষণ্ণ, কোমল চোখ।

নিজেকে সামলে নিল বাসুদেব। বলল, "আপনি কালই যাবেন ?"

"হ্যাঁ, কাল।"

"কোথায় ?"

"মোগলসরাই। ছোট বোনের কাছে।"

"কলকাতায় ফিরবেন না ?"

"ফিরতে তো হবেই।"

"কেন ?"

"কি জানি!...হয়ত অভ্যেস বলে। হয়ত আর কোনো উপায় নেই বলে।"

বাসুদেব সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "আপনি সত্যি সত্যি কোথায় যাচ্ছিলেন ? মোগলসরাই ? না, অমলেশকে দেখতে আসছিলেন ?"

মণিমালা বলল, "কি জানি। ঝোঁকের মাথায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম, ছোট বোনের কাছে যাব। আবার মনে হল, অমলেশকে একবার দেখে যাই। সে বলেছিল, সহ্য করতে। ভাবলাম, তাকে বলে যাই, সহ্য তো করলাম। কিন্তু কী লাভ হল ?"

চোখ ফিরিয়ে নিল মণিমালা।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বাসুদেব বলল, "আপনি অনেক দেরি করে এলেন।"

"আমার কপাল।...মানুষ তো তার আসার সময় জানে না।"

মণিমালা ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে চলে গেল।

বাসুদেব কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে এসে দেখল, মণিমালা বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝিরে। মিহি শব্দ।

বাসুদেবের দু চোখে জল এল।

"মণিদি?"

"উঁ!"

"নতুন করে আর ভিজবেন না।"

"না। আর ভিজব না।"

বাসুদেব তার ঘরের দিকে চলে গেল।